ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ।। ২৭ চৈত্র, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১৩) ১১ এপ্রিল ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

অর্থমন্ত্রীর মিথ্যাচারেই দুরবস্থা সি পি এমের

গূঢ়পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার যে এবার হবে না তা এখন স্পষ্ট। তবে পরিবর্তনের যে হাওয়া রাজ্যজুড়ে উঠেছে সেটা সিপিএমের বিপক্ষে যতটা ততটা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে নয়। বলা যেতে পারে সিপিএম বিরোধী সেই খোলা হাওয়া পালে লাগিয়ে তৃণমূলের নৌকা দ্রুত রাইটার্সের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিপিএম বিরোধী মানুষের ক্ষোভের হাওয়াকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে যতটা রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগিয়েছে সেভাবে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল কাজে লাগাতে পারেনি। সিপিএম বিরোধী জনমতের শীর্ষে মমতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে

অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত

কোনও সন্দেহ নেই।

সময়ের সঙ্গে সমাজ জীবনের পরিবর্তন হয়— এ' তথ্য অজানা নয়। টানা ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এই সময়ের নিয়মেই বামপন্থীদের এবার বিদায় নিতে হবে। তবে ক্ষমতার উত্থান-পতনের পিছনে প্রত্যক্ষ কিছু কারণ থাকে। বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিল ইন্দিরার জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদী হাওয়ায় পাল তুলে। জরুরী অবস্থা চলার সময় সারা দেশজুড়ে সঙ্ঘ পরিবার এবং তদানীন্তন জনসঙ্ঘের সদস্য সমর্থকরা যেভাবে যতটা অত্যাচারিত হয়েছিলেন তার তুলনায় কম্যুনিস্টরা অনেক অনেক ভাল অবস্থায় ছিলেন। তবু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কম্যুনিস্টরা জনমানসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী ক্ষোভকে রাজনৈতিক লাভে পরিণত করার কৌশল হাতে কলমে দেখিয়েছিলেন বামপন্থীরা।

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজা ও অন্যান্যদের নামে চার্জশীট সি বি আইয়ের

এ রাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সি বি আই প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী আন্দিমুথু রাজা, তাঁর দপ্তরের অধীন উচ্চপদস্থ অফিসার সহ মোট নয়জনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিচারক ও পি সাইনির আদালতে প্রথম দফার বিশাল চার্জশীট দাখিল করেছে। ওই চার্জশীটে টেলিকম দপ্তরের প্রাক্তন সচিব সিদ্ধার্থ বেহুরা, তিনটি টেলিফোন কোম্পানীর (১. রিলায়েন্স টেলিকম, ২. সোয়ান টেলিকম, ৩. ইউনিটেক ওয়ারলেস) কর্তাব্যক্তি—সঞ্জয় চন্দ্রা, সাহিদ বালওয়া এবং বিনোদ গোয়েঙ্কার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ষড়যন্ত্রে সহায়ক হিসেবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডি এম কে দলের নেতা এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রী এ রাজাকে ২-জি স্পেকট্রাম বণ্টনে বিশাল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করতে হয়। পরে সি বি আই তদন্তে নেমে রাজাকে গ্রেপ্তার করে। বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত অভিযোগ ছিল, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কারণে দেশের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে রাজাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে। পরে ক্যাগ (সি এ জি) রিপোর্টেও একই কথা বলা হলে রাজাকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে বরখাস্ত করেন মিস্টার ক্লীন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং। শুধু টেলিকম নয়— কমনওয়েলথ গেমস, আদর্শ আবাসন, বোফর্স— কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে দুর্নীতি যে কী পর্বতপ্রমাণ হয়েছে সি বি আই-এর চার্জশীটই তার নজির এবং এটিও হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

(এরপর ৪ পাতায়)

বাক্সবন্দি চার্জশীট আদালতের পথে।

জন্মলগ্নেই সরকারী রোষানলে স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৯৫০ সালের ১৬ মার্চের একটি চিঠি। পত্রপ্রেরক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী; পত্রপ্রাপক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। সদ্য- গঠিত পাকিস্তান থেকে নির্যাতিত হয়ে হিন্দুরা দলে দলে এপারে আসছে, তুলনায় এপার থেকে ওপারে যাওয়া মুসলমানের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পূর্ব-পাকিস্তানগামী এরকম কিছু মুসলমানের সঙ্গেই শিয়ালদহ স্টেশনে দুর্ব্যবহারের 'ভয়ানক অভিযোগ' উঠেছে। অভিযোগকারিণী গান্ধীজী'র একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমতুস সালাম। অভিযোগ শুনে পণ্ডিত নেহরু ভীষণ ক্ষুব্ধ। 'পাকিস্তান' হয়েছে তো কি হয়েছে? তা বলে নেহরুর রাজত্বে মুসলমানদের অপমান করবে এত সাহস কার? ক্রুদ্ধ নেহরু চিঠি পাঠালেন বিধান রায়ের কাছে। সেই চিঠিতে শিয়ালদহ স্টেশনে কিভাবে মুসলমানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে সেবিষয়ে বিস্তারিত ফিরিস্তির পাশাপাশি আমতুস সালাম ও

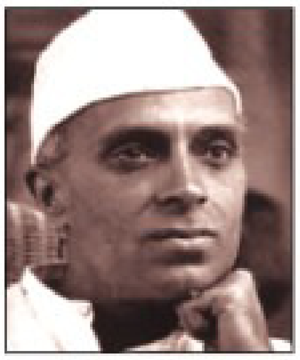
জওহরলাল নেহরু

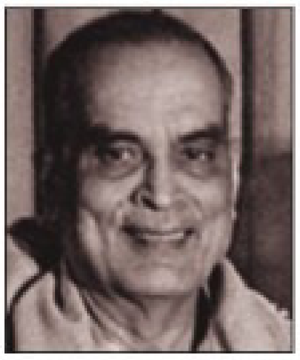
বিধানচন্দ্র রায়

অন্যান্য মুসলিম অভিযোগকারীদের বক্তব্য বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে এনিয়ে দায়ী করা হয়েছে কলকাতার সংবাদমাধ্যমের একাংশকে। নেহরু বিধান রায়কে লিখেছেন—"I gave a note to Amal Home today to be shown to some newspaper editors. I asked him to give you a copy. I feel that Calcutta papers are responsible for a great deal of mischief and this must be brought home to them. They are very irresponsibly with fire. Among the worst papers the RSS Swastika, Jugantar, Basumati and Amrita Bazar Patrika." চিঠির সারাংশ করলে দাঁড়ায় মুসলমানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে যে মারাত্মক ভুলটা করা হয়েছে তার দায় এড়াতে পারে না কলকাতার সংবাদপত্রগুলি। ওরা আগুন নিয়ে খেলছে। এরকম বাজে কয়েকটি সংবাদপত্রের নাম— আর এস এস স্বস্তিকা, যুগান্তর, বসুমতী এবং অমৃতবাজার পত্রিকা।

ছ' দশকেরও বেশি সময় আগেকার এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের সদ্য প্রকাশিত 'দি সিকল অ্যান্ড দি ক্রিসেন্ট ঃ কমিউনিস্ট মুসলিম লিগ

(এরপর ৪ পাতায়)

উদ্বাস্তু ইরানীরাই নিরাপত্তার বড় চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রায় দেড়শ' বছর আগে ইরান থেকে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁরা। বৃটিশ ভারতবর্ষে ঠাঁই মিলেছিল তাঁদের। ৭৭ বছরের বাতে পঙ্গু বৃদ্ধ সর্দার সৈয়দ আশিক আলি কিংবা ২৪ বছরের নাজির হুসেন— কারুরই সৌভাগ্য (নাকি দুর্ভাগ্য) হয়নি মাতৃভূমি ইরান দর্শনের। বৃটিশ ভারতবর্ষে ইরানী উপনিবেশ গড়ার যে প্রয়াস তাঁরা করেছিলেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেও তার ব্যত্যয় হয়নি। কিন্তু এই ভারতবর্ষ আজ নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামিক দুনিয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু-শরণার্থী স্রোতে জর্জরিত, অনুপ্রবেশকারী সমস্যায় জেরবার। আর এখানেই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা উঠে আসছে তা হলো, বহু বছর বংশানুক্রমে এদেশে থাকার সুবাদে এঁরা ভারতীয় ভোটার পরিচয়পত্র পেয়ে গেছেন। কিন্তু ইসলামিক দুনিয়ার বর্তমান ডামাডোলে দেশের নিরাপত্তায় কতটা মাথা-ব্যথার কারণ হচ্ছেন এই ইরানীরা? অর্থাৎ একদিকে তাঁরা

(এরপর ৪ পাতায়)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, ছাপার খরচ, পত্রিকা পাঠানোর খরচ, পত্রিকা প্রকাশের আনুষঙ্গিক খরচ প্রভৃতি ক্রমাগত বেড়ে চলার জন্য স্বস্তিকা'র মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে পত্রিকা প্রকাশের খরচ বেড়ে চলা সত্ত্বেও স্বস্তিকা'র দাম বাড়ানো হয়নি। এবার অনেকটাই নিরুপায় হয়ে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হলো। নচেৎ পত্রিকার প্রকাশনা অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

আগামী ১৮.০৪.২০১১-র সংখ্যা অর্থাৎ নববর্ষ - ১৪১৮-র সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র পরিবর্তিত মূল্য নিম্নলিখিত হারে প্রযোজ্য হবে ঃ

সাধারণ সংখ্যা ৪ টাকার পরিবর্তে ৫ টাকা হবে।

পূজা সংখ্যা এবং অন্যান্য বিশেষ সংখ্যার মূল্য যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

বার্ষিক গ্রাহক (অন্তর্দেশীয়) মূল্য ২০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা হবে।

বার্ষিক গ্রাহক (বহির্ভারত) মূল্য অপরিবর্তিত থাকবে।

পরিবর্তিত মূল্যের কারণে আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত কিন্তু অনন্যোপায়। আমরা বিশ্বাস করি, বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও পৃষ্ঠপোষকগণ স্বস্তিকা'র প্রচার ও প্রসারে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

— স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

নবরূপে স্বস্তিকা'র প্রকাশ

হিন্দুত্ব তথা জাতীয় চেতনার প্রচার ও প্রসারে সমর্পিত সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলির বিগত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে স্থির হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী 'নববর্ষ সংখ্যা ১৪১৮' (১৮ই এপ্রিল - ২০১১) থেকে স্বস্তিকা'র প্রতিটি সংখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। নতুন আঙ্গিকের স্বস্তিকা সুধীজনের কাছে সাদরে গৃহীত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আঙ্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলি আরও আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

সকল গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীগণের যথোচিত সহায়তায় স্বস্তিকা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই কামনা করি।

— স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

‘অষ্টম বামফ্রন্ট’ প্রতিষ্ঠার ঢক্কানিনাদেও জনমানস উদাসীন

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

নির্বাচনী অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসেছে। এই পর্যায়ে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট অষ্টম বামফ্রন্ট হবেই বলে প্রচারের ঢক্কানিনাদ করে চলেছে— বাস্তবে এই প্রচার সমগ্র ‘‘মিডিয়া’’-এর প্রচারে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই প্রচার সিপিএম তথা বামদলগুলির সভ্য এ জি সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যতই গৌতম দেব বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উচ্চৈঃস্বরে দলের কথা বলুন অথবা বিরোধীদের সমালোচনা করুন—সে থেকে যে বাম-কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে না সেটা স্পষ্ট ভাবে প্রকটিত। কারণ সিপিএম-এর সমস্ত পার্টি সদস্য, এ জি সদস্য এবং ফ্রন্ট সংগঠনের সদস্যদের সেভাবে লেগে পড়তে দেখা যাচ্ছে না। দেওয়াল লিখনেও আগে আগে যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যেতো বহু নতুন কর্মী এসে দেওয়াল চিত্রণ-এ হাত লাগাতেন— সে দৃশ্য এ-বারে অনুপস্থিত। কর্মীদের একাংশ যেহেতু মনে করেন না অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হবে না সে-হেতু তাঁদের মধ্যে একাংশ নিষ্ক্রিয় থাকছে নির্বাচনোত্তর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। আর এক অংশ, যারা ক্ষমতায় আসতে পারে তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। আর এক অংশ ‘‘ওয়েট অ্যান্ড সি’’ করছেন। অন্য এক অংশ পুরানো অঙ্কে ভাবছেন, অর্থাৎ নির্বাচনের দিনেই ‘‘ওয়ান-ডে ম্যাচ’’ করে দেবো। এই ‘ওয়ান ডে ম্যাচ’ স্লোগানটি রাজ্যের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিম-এর উদ্ভাবন। এরা বুঝতে পারছেন না যে, প্রচারে পুরানো প্রথায় ব্যবস্থা করা যাবে না। কারণ এবারে পুলিশ, রাজ্য প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন প্রায় সকলেই বিরুদ্ধে— কাজেই ট্যাফুঁ করা যাবে না।

বিভিন্ন জেলার বিশাদ খবর পাওয়া-না- গেলেও কলকাতার আশে-পাশের কয়েকটা কেন্দ্রের অবস্থা দেখে সিপিএম-এর শোচনীয় দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! বেহালাতে বিরোধী-নেতা পার্থ চ্যাটার্জি-এর এলাকায় সিপিএম-কে খুঁজতে দূরবীক্ষণ লাগছে। মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের এলাকায় কুমকুম চক্রবর্তীর অবস্থাও করুণ।

সল্টলেকে সিপিএম কর্মীরা ঘরে বসে অঙ্ক কষছেন যার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি হাতছাড়া হয়েছে। এই ঘরে বসার নীতির একটা চিত্র তুলে ধরা যাবে। যেমন বি বি ব্লকে যেখানে পরাজিত কাউন্সিলার— যিনি গণনাট্য সংঘ তথা চিত্রজগতের বিখ্যাত সজল রায়চৌধুরী-রেবা রায়চৌধুরীর কন্যা। তিনি কেন পরাজিত হলেন? তিনি তো স্থির নিশ্চিত জিতবেন— কিন্তু তিনি যে ব্লক-এর বাসিন্দা, সেই ব্লকেরই বামপন্থী-কমিউনিস্ট ভোটাররা তৃণমূলকে ভোট দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি গাছকাটা নিয়ে প্রচার চালিয়ে পরাজিতের খাতায় তাঁর নাম তুলিয়েছে। কাশীপুর বেলগাছিয়াতেও রাজদেও গোষ্ঠী নামেনি। কলকাতার সব এলাকাতেই সিপিএম বামফ্রন্ট এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে বহু পিছিয়ে আছে।

বুদ্ধবাবুর যাদবপুরেতেও কলকাতা পার্টি জমায়েত করতে পারছে না। দমদমে তো গৌতম দেব-কে জব্দ করার জন্য আনা হয়েছে। এদিকে তো গৌতমবাবু টিভিতে দিগ্বিজয়ী হতে চাইছেন। ‘সন্ধ্যা গেলো হেলাফেলায় রাত্রিবেলায় বাতি জ্বালায়!’

বুদ্ধবাবু-গৌতমবাবু যতই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য পার্টিকর্মীদের বলুন না কেন সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের বেশির ভাগ অংশ বিনয়ী হয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা মুখে আনতে চাইছে না। সেই পুরানো কায়দা— ‘আমরা আছি, আমরা থাকবো— আমরা আসবোই’। অতএব আমাদের ভজনা কর। গণদেবতার তোয়াক্কা করবো না! জেলায় জেলায় পার্টি-দলাদলি বন্ধ করতে প্রায় বৃদ্ধ বিমান বসু মাকুর মতো এধার ওধার করছেন। কারণ এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর বিমান বসুর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উত্থান-পতন নির্ভর করছে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত তো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে— বৃদ্ধরা রাজনৈতিক বাণপ্রস্থে যাক।

সিপিএম-এর ছাত্র-কর্মীরা প্রধানত ছাত্র-ছাত্রী প্রার্থীদের ব্যাপারেই উদগ্রীব। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এফ আই-এর ভরাডুবি ঘটেছে। কলকাতার ছাত্র-যুব ফ্রন্ট দেখার দায়িত্ব যাঁর তিনি কি বলছেন? শুধু বক্তৃতা বাজি করলেই হয় না। হাতে কলমেও কিছু কাজ করা অবশ্য কর্তব্য।

বরানগরে বেআইনি যে অস্ত্র কারখানা ধরা পড়েছে— সে ব্যাপারে চুলচেরা তল্লাশি এবং বিচার দরকার। তা না হলে হাঙ্গামাকারীরা উৎসাহিত হবে। এরই পাশাপাশি তৃণমূল-এর অবস্থাটা দেখা যাক— নেত্রীর পদযাত্রায় গণ-বিস্ফোরণ ঘটছে। এরকম মিছিল ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সিপিএম এরকম জমায়েত করতে পারবে না।

এইসব মিছিল থেকে এটা পরিষ্কার সিপিএম-এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ এখনও প্রশমিত হয়নি। সিপিএম হারবে নিজের অপকীর্তির জন্য। ‘‘নিজ দোষে স্বর্ণলঙ্কা আপনি ডুবাইলা।’’ অহঙ্কারই পতনের কারণ। মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেসি সাংসদ যথার্থই বলেছেন ‘‘বামফ্রন্ট পরাজিত হবে নিজের দোষে— পরিবর্তন হাওয়াতে নয়।’’

দার্জিলিং-এর মোর্চা তৃণমূলকে সমর্থন জানাচ্ছে? অথচ বিগত লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করেছিল।

এ-রাজ্যের কংগ্রেস-কে সাইনবোর্ড-এ পরিণত করার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের খেয়োখেয়ি চলছে। কংগ্রেস প্রার্থীরা নিজের এলাকায় নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছেন। কংগ্রেসের প্রচার নেই— যা আছে তা তৃণমূলের আশ্রিত। রাজ্য কংগ্রেসের প্রচার কমিটিতে ৪০ জন সদস্য। কিন্তু আহ্বায়ক প্রদীপ ভট্টাচার্য নয় কেন? রাজ্য কংগ্রেসের বেশির ভাগ নেতা বলছেন ‘‘প্রণববাবুর রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এসে গেছে— তাই নিজের ছেলেকে বিধায়ক করে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী করার প্রয়াসে সাফল্য চাইছেন।’’ অধীর চৌধুরীর আর একটি কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য ‘‘কংগ্রেস দুর্বল হচ্ছে— বিজেপি কেন্দ্রে শক্তিশালী হচ্ছে।’’ অষ্টম বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনও প্রত্যয়ী অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে না। উত্তর বাংলার নির্বাচন দৃশ্য দেখে আরও বোঝা যাবে।

নেপথ্য কাহিনী

বর্বরতার উদাহরণ মরিচঝাঁপি

বিশেষ প্রতিনিধি।। মরিচঝাঁপি শুধু একটা নাম নয়— এটি হলো বামফ্রন্ট আমলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর এক কলঙ্কময় কীর্তি। এই কীর্তির সময়ে স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন মনীশ গুপ্ত। যিনি এবারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন। মরিচঝাঁপি ঘটনার উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করার ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের বাস করা অসম্ভব হওয়াতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এ-বঙ্গে চলে আসছিলেন। সময়ে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ওই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বসতির জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কমিউনিস্টরা বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই হতভাগ্য ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা পরবর্তীকালে পুনর্বাসনের জন্য খালি পতিত জমিতে যেতে চাইছিলেন। এরই ফলে ১৯৭৮-এর এপ্রিল মাসে হাজার হাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু সুন্দরবনের কুমীরমারীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে আশ্রয়ের আশায় গেলেন। এখানে

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী বসতি (’৭৮)।

দণ্ডকারণ্য থেকে ৩০ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয়ের জন্য এসেছিলেন। এদের এই বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন জ্যোতি বসুরা সহ্য করতে পারেননি। চরম অত্যাচার নেমে আসে এঁদের উপর। কয়েকশত নিখোঁজ হন, কয়েকশত নিহত- আহত হন। এই অত্যাচার সম্পর্কে অ্যালেন গিনসবার্গ যে ছোট কবিতা লিখেছিলেন— সেটির অনুবাদ পড়লেই বোঝা যাবে অত্যাচারের কথা— ‘‘লক্ষ লক্ষ শিশুর যন্ত্রণালব্ধ কান্না উন্মুক্ত আকাশের নিচে বৃষ্টিতে ভিজে লক্ষ লক্ষ মায়ের আর্তি, লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় শিশুদের অবস্থান।’’

মরিচঝাঁপি ইতিহাসের অন্তরালে চলে গেছে। আজকে সেই ঘটনা মানুষ ভুলে গেছে। সেদিন মরিচঝাঁপিতে যা’ হয়েছিল তা নন্দীগ্রাম-নেতাই-এর ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। কিন্তু এ-ব্যাপারে ডান-বাম সবার কণ্ঠ আজকে রুদ্ধ।

সেদিন যা হয়েছিল তা হলো প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে শতসহস্র শিশু-মা কী যন্ত্রণায় নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরেছেন। এই ভাবেই অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জ্যোতি বসুদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ এই অত্যাচারীদের অপসারণে আজ তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিশ্বকাপ ও জাতীয় আবেগ

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের বিজয়কে কেন্দ্র করিয়া সারাদেশ জুড়িয়া যে আবেগের বন্যা প্রবাহিত হইল, তাহাতে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী মাত্রই কমবেশী অংশীদার। আনন্দিত ও গর্বিত দেশীয় সংবাদমাধ্যম। এই জয়কে 'ভুবনজয়ী' 'বিশ্বজয়ী', 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা', 'The World at our feet', 'Windia' ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়াছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের জয়লাভে জাতীয় আবেগের এই আন্দোলন অবশ্য নতুন নহে। আজ হইতে ঠিক একশত বর্ষ পূর্বে ১৯১১ সালে কলকাতায় শাসক ইংরেজদের দলকে ফুটবল খেলায় পরাজিত করিয়া আই এফ এ শীল্ড জয় জাতীয় আবেগকে মথিত করিয়াছিল। এই শতাব্দীব্যাপী কালখণ্ডে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া এই জাতীয়ভাব বা আবেগকে উদ্দীপিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু ঘটনা হইল, এই আবেগ তাৎক্ষণিক, কোনও ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া উদ্দীপিত হইয়াই আবার স্তিমিত হইয়া যায়। কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে সেই আবেগ আর লক্ষ্য করা যায় না। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সারাদেশ, বিশেষত বাংলা যে আবেগে উদ্দীপিত হইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহার মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের সূত্রে বঙ্গ বিভাজনের যখন ছক কষা হইল, তখন আর সেই জাতীয়ভাব বা আবেগ লক্ষ্যগোচর হইল না। দুর্ভাগ্যের হইলেও ইহা বাস্তব এবং রূঢ় বাস্তব। সেই অপরিণামদর্শিতা আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে।

খেলা ও রাজনীতি এক নহে বলিয়া এদেশের যেসব লোক শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকারের বাপান্ত করিয়া ছাড়িতেছেন, তখন তাহাদেরই নেতা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পাক-প্রধানমন্ত্রী গিলানিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া রাজনৈতিক বার্তা বিনিময় করিতেছেন। বস্তুত খেলা ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। মূল বিষয় হইল—জাতীয় স্বাভিমান, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় আবেগ রক্ষায় তাহা হইতেছে কিনা! এই প্রশ্নে আমাদের দেশে সেকুলারিস্ট বলিয়া পরিচিত দল ও ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে কাহাকেও বন্দনা, কাহাকেও নিন্দা করিতেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তাহাদের এই দ্বিচারিতা, এই ভণ্ডামি, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লালসা জাতীয় জীবনের ভাব-ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছে। আত্মপরিচয়ের যে গৌরববোধে জাতি উদ্বেলিত হয়, সেই আত্মপরিচিতিকে ভুলাইয়া দিতে চাহিতেছে। সার্ধজন্মশতবর্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানাবিধ পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও পুরস্কারাদি ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার 'আত্মপরিচয়' সম্পর্কিত ভাবনাটিকে—''মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম''— তুলিয়া ধরা তো দূরের কথা, সযত্নে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য মনীষীদের ভাব-ভাবনাকে নিজেদের মতো করিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। আর এরই বিষময় পরিণাম হিসাবে সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, জাতীয় শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলির প্রতি অসম্মান, ইতিহাস বিকৃতি, শত্রু-মিত্র ভাবনার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। গল্পের ভেড়ার পালে পালিত বাঘ তখনই গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল যখন বনের বাঘ দিঘীর জলে তাহার মুখ দেখাইয়াছিল। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন নিদ্রাভঙ্গ করানো যায় নাই তখন রাবণের 'কুম্ভকর্ণ' ডাকেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। মহাবীর হনুমান তখনই সমুদ্র লঙ্ঘনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন যখন জাম্বুবান তাহার বিস্মৃত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। যাহা ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে সত্য জাতির ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। এই গ্লোবালাইজেশন বা ভুবনীকরণের যুগেও জাপানে জাতীয় আবেগ তথা স্বাভিমানবোধ যে কত প্রখর একটি নজিরই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আমেরিকা বিশাল পরিমাণ লেবু রপ্তানি করিয়া জাপানের বাজার দখল করিতে চাহিয়াছিল। একটি লেবুও না কিনিয়া জাপানবাসী আমেরিকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। শুধু কোনও বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া নয়, এই জাতীয়ভাব বা আবেগকে সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। 'দেশপ্রেম দিবস'-এর খোপে ঢুকাইয়া যাহারা এই আবেগকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। জাতির একজন হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তি যখন নিরন্তর অনুভব করিবে—ভারত আমার মা, আমি ভারতের; স্বাভিমানবোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সোচ্চারে ঘোষণা করিবে—'ভারতমাতা কী জয়,' তখনই, এবং শুধু তখনই ভারত আবার জগৎ সভায় শুধু ক্রিকেটে নয়, সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ মানবিক কল্যাণকে প্রভাবিত করেছে। ...এই ভারত বিপরীতের মিলন-ক্ষেত্র; যা নৈর্ব্যক্তিক আর যা অতি আধিভৌতিক তা মিলেছে এখানে। এই দেশ একদা সেই বৈপ্লবিক প্রতীক দান করেছিল যার নাম শূন্য (জিরো), আবার মানুষের গৃহ-বিরহ জনিত আগ্রহকে সজীব করে রেখেছে উপকথা এবং রূপকথার মাধ্যমে।...ভারত শুধু ধর্মীয় নয়, তীর্থ-যাত্রার বৈজ্ঞানিক গন্তব্য পথে পরিণত হয়েছে 'মহামানবের সাগরতীরে'।

—ওয়ালটার লাইফার

উত্তরবঙ্গের 'নন্দীগ্রাম' তিনবিঘা নিয়ে ভোল পাল্টাচ্ছে সিপিএম

সাধন কুমার পাল

চলমান পরিবর্তনের হাওয়া যে পরিবর্তন বিরোধীদেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল অতি সম্প্রতি তিন বিঘায় অনুষ্ঠিত একটি সরকারি অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিন আগে তিন বিঘা করিডর থেকে ২০০ মিটার দূরে ১৬ বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠা একটি নির্মীয়মান পার্কের প্রাক্-নির্বাচনী উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুজন মন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী পরেশ রায় ও বনমন্ত্রী অনন্ত রায়। এই সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএম- এর এক নেতার ভাষণে উঠে আসে তিন বিঘা করিডরের উপর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত উড়াল পুল নির্মাণের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক। অথচ, যে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার আজ উড়াল পুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সেই একই চুক্তি অনুসারে ১৯৯২-এর ২৬ জুন বাংলাদেশের হাতে তিন বিঘা করিডর হস্তান্তরের পক্ষে সিপিএম শুধুমাত্র নীতি গত ভাবেই নয়, সমস্ত সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই করিডরটির হস্তান্তর বিরোধী গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক মানুষের উপর। এখন থেকে প্রায় ঊনিশ বছর আগে নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর ক্যাডার পুলিশ যৌথ অত্যাচারের স্মৃতি ও তার থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ এখনও উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো জাগ্রত রয়েছে। সিপিএম-এর সাংগঠনিক ঠাসবুনোট এতদিন তা প্রকাশিত হতে দেয়নি। কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ায় এই সাংগঠনিক বুনোট আলগা হতেই মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দেশভাগ, গোর্খাল্যাণ্ড, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূল্যায়ণের মতো বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে সিপিএম দলের মত পাল্টানো ভোল পাল্টানো ভুল স্বীকারের তালিকায় যে 'তিন বিঘা আন্দোলনে পার্টির ভূমিকা' নতুন করে সংযোজিত হতে চলেছে--- এই বিষয়ে বোধহয় খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিন বিঘাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে সরকারের তরফে তিন বিঘা হস্তান্তরকে সেটেল্ড ফ্যাক্ট (settled fact) হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস হলেও কোচবিহার-জলপাইগুড়ির মানুষের কিন্তু ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার আয়তনের করিডরটি ভারতভূমির মধ্যে গভীর ক্ষতের মতোই মনে হয়। কারণ, (১) যে সমস্ত চুক্তির সাহায্যে বাংলাদেশ দহগ্রাম ও আঙ্গরাপোতা ছিটমহলগুলোতে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের তার মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, সেই একই চুক্তির সাহায্যে কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলোতে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার কোনও আন্তরিক প্রয়াস ভারতের তরফে লক্ষিত হচ্ছে না। (২) শুধুমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এই করিডরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকার কেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে তাও আমজনতার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এটা এই জন্যই যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা নামক বিষয়গুলো রাষ্ট্রনেতাদের কাছে মহামূল্যবান হলেও গরুপাচার, চোরাকারবার, সীমান্ত অপরাধের জেরে তিতিবিরক্ত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা সীমান্তবাসী আমজনতার কাছে এগুলো অর্থহীন। এই করিডর দিয়ে অঙ্গারপোতা ও দহগ্রাম নামক যে ছিটমহল দুটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তার সাথে কাঁটাতারহীন ভারতীয় সীমান্ত এতটাই অরক্ষিত যে জেহাদী ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ, জন্য অনুপ্রবেশ, গরুপাচার ও চোরাচালানের জন্য এর চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হতে পারে না। অবৈধ ক্রিয়াকলাপ রোধে নজরদারি চালানোর জন্য সরকার অতি সম্প্রতি ছিটমহল দুটিকে ঘিরে ২৪টি পাকা পয়েন্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেও স্থানীয় মানুষের মতে এগুলো বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরো ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) ১৯৫৮-র নেহেরু-নুন চুক্তি অনুসারে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) ঢুকে যাওয়া (ছিট নয়) ভৌগোলিক ও প্রতিরক্ষা গুরুত্বহীন দক্ষিণ বেরুবাড়ির দক্ষিণ অর্ধাংশের হস্তান্তরের বিনিময়ে ৭৪-এর ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অনুসারে তিন বিঘা হস্তান্তর করে যে ভারত সরকার দেশের প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বিষয়ে আজও বোধহয় কোনও সন্দেহ নেই। ২৪ ঘণ্টার জন্য এই করিডরটি বাংলাদেশের হাতে তুলে দিলে সেই বিপদ যে আরও বাড়বে এই বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের আরও বহুবিধ রাস্তা থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার মতো অতি-স্পর্শকাতর বিষয়ের সাথে কেন আপোস করছে এই বিষয়টি উত্তরবঙ্গের অনেক চিন্তাশীল মানুষের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না।

সিপিএম নেতারা বলবেন 'সেদিন পার্টি ভুল করে ছিল। তিনবিঘা হস্তান্তরের ব্যাপারে মানুষের আবেগ যে কতটা গভীর সে সময় পার্টি তা বুঝতে পারেনি।' যা কিনা হবে সিপিএম-এর স্বীকার করা ভুলের তালিকায় নবতম সংযোজন।

(৪) গত ২০ জানুয়ারি ঢাকায় ছিটমহল বিলোপ করে এগুলোতে বসবাসকারী মানুষদের তাদের ইচ্ছে অনুসারে ভারত বা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য দু'দেশের সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেল। ছিটমহলগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, ছিটের বাসিন্দা তো বটেই এমন কি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল অনেক বিশিষ্ট মানুষই এই সমস্যা এত সহজে মিটবে বলে বিশ্বাস করেন না। ফলে তিন বিঘা করিডর ২৪ ঘণ্টার জন্য বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া ও কুচলিবাড়ির মানুষের যাতায়াতের জন্য ওড়াল পুল নির্মাণের প্রেক্ষাপট তৈরির উদ্দেশ্য নিয়েই ঢাকায় সচিব পর্যায়ের বৈঠক ডেকে ছিট-সমস্যা সমাধানের নাটক করা হচ্ছে এমন সন্দেহ কিন্তু মানুষের মনে ক্রমশই দানা বাধছে।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। উড়ালপুল নির্মিত হলে বাংলাদেশ ঘেরা কুচলিবাড়ি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ছিটমহলে পরিণত হবে, ক্ষুণ্ণ হবে দেশের সার্বভৌমত্ব, এরকম একটি ইস্যু কোচবিহার জলপাইগুড়ি বিশেষ করে মেখলিগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচনী ময়দান দাপিয়ে বেড়াবে না তা কি করে হয়? ফলে উড়াল-পুলের গল্প শুরু হতেই প্রত্যাশা মতোই ফরওয়ার্ড ব্লক মাঠে নেমে পড়েছে। গত ডিসেম্বরের শেষে মেখলিগঞ্জে বিশাল জনসভা করে ফ.ব. নেতারা জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনবিঘা হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলনে তারা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এর জন্য দলের মধ্যে ভাঙ্গন পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল ঠিক একইরকম ভাবে এবারও দল শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে উড়াল পুল নির্মাণ রুখবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জোটসঙ্গী সিপিএম-কে নিয়ে। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে পুলিশ ক্যাডার যৌথ অত্যাচারের দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখে, খবরের কাগজে পড়ে তিনবিঘা আন্দোলনের সাক্ষী মানুষদের বলতে শোনা গেছে ১৯৯২-এ মেখলিগঞ্জের মাটিতে একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। সেদিন ময়নাগুড়ি, ভোটপট্টি, চ্যাংরাবান্দা, চৌরঙ্গী, জামালদহ, ডাঙ্গারহাট, ধাপড়া, মেখলিগঞ্জ শহর লাগোয়া এলাকা গুলোতে তিন বিঘা হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলনকারীরা কোথায় কোথায় আত্মগোপন করে আছে, তারা কোন কোন জায়গাতে বসে শলা-পরামর্শ করছে কাকে কোথায় পাওয়া যাবে এই সমস্ত তথ্য পুলিশকে দেওয়া ছাড়াও লোক ঢুকিয়ে দিয়ে আন্দোলনকারীদের সমস্ত পরিকল্পনা আগাম প্রশাসনকে জানানোর দায়িত্ব নিয়ে ছিল সিপিএম ক্যাডাররা। পুলিশকে শুধুমাত্র খবরাখবর দিয়েই সিপিএম চুপচাপ বসে ছিল না। শোনা যায় পুলিশের পোশাক পরে সেদিন তারা সশরীরে আন্দোলনকারীদের মোকাবিলা করতে নেমে ছিল। কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিজেপি-র ডাকে মেখলিগঞ্জের বাইরে থেকে যে সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ তিনবিঘা হস্তান্তর বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিতে আসছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাস থেকে, ট্রেন থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে মারধোর করে ফেরত পাঠিয়ে, হলদিবাড়ি থেকে তিস্তা পার হয়ে যারা তিন বিঘায় আসার চেষ্টা করছিলেন নদীতে চুবিয়ে তাদের মেরে ফেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। ক্যাডাররা সেদিন অত্যাচারের এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছিল। ক্ষমতায় মদোন্মত্ত সিপিএম-এর কাছে সেদিন মানুষের আবেগের কোনও মূল্য ছিল না।

এখন যদি সিপিএম নেতাদের প্রশ্ন করা হয়, যে আন্তর্জাতিক চুক্তি রূপায়ণের দায়বদ্ধতা দেখিয়ে কেন্দ্রে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পরের দশকে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের সাহস না দেখালেও আপনারা বাংলাদেশকে তিন বিঘা হস্তান্তরের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছিলেন কেন? আবার সেই একই চুক্তির অঙ্গ হিসেবে আজ উড়াল-পুল নির্মাণের বিরোধিতা করছেন কেন? এ বিষয়ে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই প্রশ্নের উত্তরে সিপিএম নেতারা বলবেন 'সেদিন পার্টি ভুল করে ছিল। তিনবিঘা হস্তান্তরের ব্যাপারে মানুষের আবেগ যে কতটা গভীর সে সময় পার্টি তা বুঝতে পারেনি।' যা কিনা হবে সিপিএম-এর স্বীকার করা ভুলের তালিকায় নবতম সংযোজন।

রাজা ও অন্যান্যদের নামে চার্জশীট

(১ পাতার পর)

সি বি আই প্রদত্ত প্রথম চার্জশীটেই ক্ষতির পরিমাণ ৩০,৯৮৪.৫৬ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ রাজার পরে যিনি টেলিকম দপ্তরের মন্ত্রী হন সেই কপিল সিবাল এককথায় এক পয়সাও আর্থিক ক্ষতি হয়নি বলে দাবী করে বিস্তর গলাবাজি করেছিলেন। সি বি আই প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। একই অভিযোগ আনা হয়েছে রাজার ওই কাজে যারা সহায়ক ছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও।

এ রাজার সহায়ক হিসেবে সি বি আই-এর চার্জশীটে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন— টেলিকম দপ্তরের প্রাক্তন সচিব সিদ্ধার্থ বেহুরা, রাজার নিজস্ব (প্রাক্তন) সচিব আর কে চান্দোলিয়া, সোয়ান টেলিকম্-এর প্রমোটার সাহিদ বালওয়া এবং বিনোদ গোয়েঙ্কা, ইউনিটেক ওয়ারলেশ-এর সঞ্জয় চন্দ্রা এবং অনিল আম্বানীর এ ডি এ জি গোষ্ঠীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গৌতম দোসী, হরি নায়ার এবং সুরেন্দ্র পিপারা।

চার্জশীট ফাইল হতে না হতেই বিচারক পাঁচজনকেই সমন পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে এখনও অবধি হেফাজতে না নেওয়া হলেও শীঘ্রই নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এছাড়া যে তিনটি কোম্পানী সরাসরি ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে লাভবান— রিয়ায়েন্স টেলিকম, সোয়ান টেলিকম এবং ইউনিটেক ওয়ারলেসকেও আগামী ১৩ এপ্রিল পরবর্তী শুনানীর দিন হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কে বা কারা ওই তিন কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করবেন তা তাদেরকেই ঠিক করতে হবে।

চার্জশীটে ভারতীয় দণ্ডবিধির --- ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র), ৪২০ (জালিয়াতি), এবং ৪৬৮ ও ৪৭১ (দুটোই জালিয়াতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) নং ধারা ছাড়াও দুর্নীতি নিরোধক আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ২-জি স্পেকট্রাম বন্টন সম্পর্কিত ১২৭ পৃষ্ঠার চার্জশীটে ১২৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে কর্পোরেট লবি করা নীরা রাডিয়া এবং অ্যাটর্নি জেনারেল জি ই বাহানবতীর নামও রয়েছে। এ রাজা টেলিকম মন্ত্রী থাকাকালীন ওই মন্ত্রকের অফিসার হিসেবে কাজ করেছে এবং অনেকেই আছেন। এছাড়া আছেন সি বি আই অফিসারগণ।

চার্জশীটে প্রাক্তন সলিসিটার জেনারেল বাহানবতী এবং বর্তমান সরকারের শীর্ষ ল-অফিসাররা আছেন উইটনেশ নং ৩২ এবং বহু বিতর্কিত নীরা রাডিয়া হলেন সাক্ষী নং ৪৪। নীরা রাডিয়া রাজসাক্ষী কিনা তা খোলসা করেননি সি বি আই-এর অফিসাররা।

সি বি আই-এর হাতের খোলা কার্ড

● রিলায়েন্স টেলিকম, ইউনিটেক ওয়ারলেশ এবং সোয়ান টেলিকম-এর নাম চার্জশীটে অন্তর্ভুক্ত।

● কর্পোরেট সেক্টরের কেষ্ট-বিষ্টুরা চার্জশীটে অভিযুক্তের তালিকায়। রিলায়েন্স টেলিকম্-এর শীর্ষস্থানীয় অফিসার গৌতম দোসী, সুরেন্দ্র পিপারা, হরি নায়ার, সোয়ান টেলকম-এর বিনোদ গোয়েঙ্কা এবং ইউনিটেক ওয়ারলেস-এর সঞ্জয় চন্দ্রা।

● চার্জশীটে সি বি আই জানিয়েছে ২-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতিতে ভারত সরকারের ক্ষতির পরিমাণ নিদেনপক্ষে ৩০, ৯৮৪.৫৬ কোটি টাকা। অথচ কপিল সিবাল (বর্তমান টেলিকম মন্ত্রী) দাবী করেছিলেন ক্ষতির অঙ্ক 'জিরো' বা শূন্য।

● ২-জি দুর্নীতিতে আদালত সি বি আই-এর চার্জশীট গ্রহণ করে ১৩ এপ্রিল অভিযুক্তদের আদালতে হাজিরার সমন পাঠিয়েছে।

● চার্জশীটে বলা হয়েছে সোয়ান টেলিকম এর সাহিদ বাওলয়া এবং বিনোদ গোয়েঙ্কা, ইউনিটেক-এর সঞ্জয় চন্দ্রারা এ রাজার সুপরিচিত। তাদেরকে তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা লাইসেন্স পেতে সাহায্য করেছিলেন।

● সি বি আই-এর দাবী অনিল আম্বানীর রিলায়েন্স গোষ্ঠী পুরো বিষয়টা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছিল।

দুরবস্থা সি পি এমের

(১ পাতার পর)

এখন সেই একই চেনা ছকে রাজনীতির দাবা খেলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে প্রয়াত সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত যে দাবার চালে জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে হারিয়ে ছিলেন। সিপিএমের সেই দাবার চালেই এবার বিমানবাবুদের হারাতে চলেছেন মমতা। ইন্দিরা বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল সিপিএম। আজ যেমন সিপিএম বিরোধী হাওয়াকে ব্যবহার করছেন তৃণমূল নেত্রী।

বাংলার জনমানসে সিপিএম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বললে এক নম্বরে থাকবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। সিপিএম দলের বর্তমান দুরবস্থার জন্য এই উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিটির টানা মিথ্যাচার, প্রতারণা ও দপ্তর পরিচালনায় অযোগ্যতা দায়ী। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে এই অর্থনীতির শিক্ষক মানুষটি বিগত তিন দশক বাংলার মানুষকে কতটা প্রতারণা করেছেন। বছরের পর ঘাটতি শূন্য বাজেট বিধানসভায় পেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকে মঞ্চ থেকে গাড়ি মানুষ সব অদৃশ্য হওয়া দেখে হতবাক দর্শকরা যেমন হাততালি দেয়। অনেকটা সেইরকম ঘাটতি বাজেটকে ঘাটতি শূন্য বলে চালিয়ে অসীমবাবু হাততালি কুড়িয়েছেন। তারপর তাঁর এই প্রতারণা ধরা পড়ার পর তিনি আর তাঁর 'জিরো ডেফিসিট' বাজেট বিধানসভায় পেশ করেননি। ম্যাজিসিয়ানের হাত সাফাইয়ের কৌশল দর্শকরা ধরে ফেললে সেই ম্যাজিক তিনি আর দেখান না। অসীমবাবুও বিধানসভার মঞ্চে সেই ঘাটতি শূন্য বাজেটের ম্যাজিক দেখাননি।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসাবে অসীমবাবু বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মাথার উপর ২ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকার দেনার খাঁড়া ঝুলছে সে কথা অসীমবাবু গোপন করেছেন। তাঁর অযোগ্যতার জন্য বাংলার অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট দেয় না। সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে অসীমবাবু পিয়ারলেস সংস্থা থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছেন। সেই টাকার সুদ আদায়েই এখন কালঘাম ছুটছে পিয়ারলেস কর্তাদের। চলতি এপ্রিল মাসের শেষে বেতন দেওয়ার টাকা ঋণ পেতে অসীমবাবু প্রাইভেট ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সকলেই 'না' বলে দিয়েছে।

সরকারি কর্মীরা নির্বাচনের মাসে বেতন সময়মত না পেলে সিপিএম বিরোধী আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে সেই কথাটা আলিমুদ্দিনের পার্টি ম্যানেজাররা বিলক্ষণ জানেন। আর তা জানেন বলেই খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রে অসীমবাবুকে জেতাতে গা ঘামাচ্ছেন না পার্টি কর্মীরা। আলিমুদ্দিনই চাইছে তাঁর বিদায় হোক।

সরকারী রোষানলে স্বস্তিকা

(১ পাতার পর)

অ্যান্ড ইন্ডিয়ান'শ পার্টিশন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯,১০,১১; প্রকাশক --- ফ্রন্ট পেজ পাবলিকেশন লিমিটেড)। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সেই চিঠিতে উল্লিখিত যুগান্তর পত্রিকা শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, ১৯০৬ সালে; প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (ঋষি অরবিন্দের ভাই), অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) প্রমুখ ঋষি-প্রতিম বিপ্লবীগণ। সেই চিঠিতে উল্লিখিত অপর সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সূচনা হয়েছিল ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ভারতের প্রাচীনতম সংবাদপত্রের মধ্যে এটি অন্যতম। বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের যশোর জেলার মাগুরের সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ী এবং স্বদেশ-হিতৈষী হরিনারায়ণ ঘোষের দুই সুযোগ্য সন্তান শিশির ও মোতিলাল ঘোষ ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এই শিশির ঘোষের অনুপ্রেরণাতেই পরবর্তীকালে ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় বসুমতীকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। নেহরুর চিঠিতে পাঠক আশাকরি এই তিনটি সংবাদপত্র ছাড়াও অপর সংবাদপত্রের নামটি পড়ে একটু চমকে গেছেন। 'আর এস এস স্বস্তিকা' নামে যে পত্রিকাটির কথা নেহরু বিধান রায়কে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, স্বস্তিকা'র পাঠক মাত্রই জানেন যে সেই পত্রিকাটি আদতে 'স্বস্তিকা', যা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। যে সময় (১৯৫০ সালের ১৬ মার্চ) এই চিঠিটি লেখা হয়েছে তার মাত্র দেড় বছর আগেই জন্ম হয়েছে স্বস্তিকা'র (১৯৪৮ সাল, ১১ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমী তিথি)। বাংলার ঐতিহ্যশালী সংবাদপত্রের জগতে তখন হামাগুড়িও দিতে না শেখা নবজাতক স্বস্তিকা'র প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী'র রোষ পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনা যে সূচনাপর্বেই বাঙালি'র অন্দরমহলে আপন লেখনী শৈলী এবং সত্য-সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল স্বস্তিকা। তখন (৮ মার্চ, ১৯৫০) ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন স্বস্তিকা'র সম্পাদক। অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর কিংবা বসুমতীর মতো তৎকালীন সময়ের সংবাদপত্র জগতের কিংবদন্তী পত্রিকা'র সঙ্গে একাসনে নবাগত স্বস্তিকাকে বসিয়ে যে কৌলীন্য নেহরু দান করেছিলেন তাতে তাঁর ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য!

পুনশ্চ, স্পষ্টতই জন্মলগ্নের সময়েই স্বস্তিকা'র বিরুদ্ধে আছড়ে পড়েছিল রাজরোষ। পত্রিকার সত্যবাদীতা ও নির্ভীকতা পরবর্তী সময়ে বহুবারই রাজশক্তির বিড়ম্বনা'র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্যাবলয়েড আকৃতি থেকে বই আকৃতিতে (১৪১৮-এর নববর্ষ থেকে) স্বস্তিকা পরিবর্তিত হবার পরও সরকারের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজের বিড়ম্বনা যে একটুও কমবে না একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

উদ্বাস্তু ইরানীরাই নিরাপত্তার

(১ পাতার পর)

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাটুকু চুটিয়ে উপভোগ করছেন, অন্যদিকে নিজস্ব ভোট-ব্যাঙ্ক গড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন সেই ইরানীরা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং অসম— এই ৫টি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন তাঁরা। ইলেকটরস্ ফটো আইডেনটিটি কার্ড (ই পি আই সি বা এপিক)-এর বলে তাঁরা আজ ভারতের বৈধ নাগরিক বলে গণ্য, বেআইনী অভিবাসী বলে নয়। এরাজ্যের বর্ধমান, আসানসোল, আদ্রা এবং মুর্শিদাবাদে এঁরা শক্তিশালী ভোট-ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই ইরানীদের সম্বন্ধে সরকারের কাছে নির্দিষ্ট কোনও তথ্যই নেই। এঁরা ভোটার আই ডি কার্ড পেয়ে যাওয়ায় সরকারের কাছে এঁরা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিবেচিত। এরপরে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন কার্ড (ইউ আই ডি) এই ইরানী'রা পেয়ে গেলে এরা যে ভারতীয় নন সেটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, এই ইরানীদের 'মোটিভ' সরকারের অগোচরে থাকলে ইসলামী-দুনিয়ার বর্তমান ডামাডোলের সুযোগ অচিরেই নিতে পারে জঙ্গিরা। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি সঙ্গতভাবে একথাটাও উঠছে--- উদ্বাস্তু ইরানীদের দায়িত্ব ভারত নেবার কে? বিশেষ করে তারা যখন আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার ফায়দাটুকু তুলতেই এদেশে ঘাঁটি গেড়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৭১-এর পর এদেশে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে সরকারের যেখানে তীব্র অনীহা সেখানে হাজার-হাজার ইরানীকে জামাই-আদর কি স্রেফ ভোট- ব্যাঙ্কের স্বার্থেই?

সমাবেশ সমাচার

সিউড়ীতে শ্রীশ্রী ত্রিশূল উৎসব

গত ২৫ থেকে ২৭ মার্চ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সিউড়ী শাখার ৫২তম বার্ষিক শ্রীশ্রী ত্রিশূল উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়।

এই উপলক্ষে আচার্য্যবরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কার্যকরী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ। আচার্য্যবরণের পূর্বে 'শ্রদ্ধা' গোষ্ঠী স্বামী অভয়ানন্দজীকে সহস্র পূর্ণচন্দ্রদর্শনকারী ব্যক্তি হিসাবে বরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুপূজারতির পর লোক-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী স্বপ্না চক্রবর্তী কর্তৃক লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

২৬ মার্চ এক বিরাট ধর্মীয় শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় এবং বনমালী পাল।

২৭ মার্চ বৈদিক শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পরে অগণিত ভক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বরকা সোরেনের পরিচালনায় সন্ধ্যায় রবীন্দ্র গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। এরপর হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে অখণ্ড ভারত ও ঐক্যচেতনার উপর বক্তব্য রাখেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের মাননীয় বিচারপতি শ্রী শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। পালাকীর্ত্তন পরিবেশন করেন সুবীর চক্রবর্তী ও তাঁর সম্প্রদায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্বামী শুভানন্দজী মহারাজের পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়।

অতিথি কলম

বিশ্বব্যাপী ভারতীয় প্রতিভার বিচ্ছুরণ

জিতেন্দ্র তেওয়ারী

১১ মার্চ ২০০৮-এ রাজ্যসভায় দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুশ্রী ডি পুরন্দেশ্বরী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'নাসায় কর্মরত ৩৬ শতাংশ বৈজ্ঞানিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আমেরিকার ৩৮ শতাংশ চিকিৎসক প্রবাসী ভারতীয় অথবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মাইক্রোসফ্‌ট্‌-এ কাজ করছে এমন ৩৪ শতাংশ কর্মচারী প্রবাসী ভারতীয় অথবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আই বি এম-এ ২৮ শতাংশ, ইন্‌টেল-এ ১৭ শতাংশ, জেরক্স-এ ১৩ শতাংশ প্রবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মরত।' সুশ্রী পুরন্দেশ্বরীর এই প্রতিবেদন সামনে আসতেই সবাই আশ্চর্য হয়েছে, গৌরব অনুভব করেছে এবং এক বিতর্ক শুরু হয়েছে যে, পরিসংখ্যান কতটা সঠিক, কোন্ সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে? এর সত্যতা অস্বীকার করা যাবে না যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভা বিশ্বসভায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিভার দ্বারা ভারত বিশ্বগগনে নিজের সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছে। ভারতের সম্মান ও প্রভাব বিশ্ব- মানচিত্রে জ্বল-জ্বল করছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ঃ

বস্তুত, ভারতবাসীরা যখন যেখানেই গিয়েছেন, ভারতীয় প্রতিভা ও সংস্কৃতি সেখানকার অধিবাসীদের উপর গভীর ছাপ রেখেছে। ঔপনিবেশিককালে ভারতীবাসীরা যখন বাইরে পা রেখেছিল তখন তাদেরকে মজুর রূপে অথবা দাস হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে দেশে তারা শ্রমিক হিসেবে গিয়েছিল, সেখানে তারা মজুররূপেই থেকে যায়নি। ফিজি, বর্মা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, গায়ানা ও সুরিনাম-এ ভারতীয় সমাজ বর্তমানে কেবলমাত্র প্রভাবী নয়; অনেক দেশে তো ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত হয়েছেন। কয়েকবছর আগে ফিজির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বাসুদেব পাণ্ডে (৯ নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত)। আজও মরিশাসের রাষ্ট্রপতি আছেন অনিরুদ্ধ জগন্নাথ। এর আগে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত স্যার শিবসাগর রামগুলাম মরিশাসের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং এখন তাঁর পুত্র ডাঃ নবীনচন্দ্র রামগুলাম ওখানকার প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুই-ই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ছেদী জগন গায়ানার প্রথম ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন; এখন ভরত জগদেও ওখানকার রাষ্ট্রপতি। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রাধ্যক্ষ এস. রামনাথম্। কমলা প্রসাদ বিসেসর গত বৎসর ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আরও আছে, যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতে রাজত্ব করেছিল, আজ তাদের সংসদে (হাউস অফ্ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডস) পর্যন্ত ভারতীয়রা পৌঁছে গেছেন; বৃটিশদের মতো ছলে-বলে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে। নিউজিল্যান্ডে জন্ম, পড়াশুনা ও বড় হওয়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত পিতা-মাতার সন্তান আনন্দ সত্যানন্দ ২০০৬ থেকে ওখানাকার গভর্নর জেনারেল আছেন। তিনি মূলতঃ এশিয়ার প্রথম এরকম ব্যক্তি যিনি এই সম্মানীয় পদে আসীন আছেন। এই বৎসরে ৯ থেকে ১০ জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস'-এর সভাপতিত্ব করেছেন শ্রী আনন্দ সত্যানন্দ। আর বর্তমান প্রতিযোগিতায় বিশ্বের মহাশক্তি হওয়ার দাবীদার আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ববি জিন্দাল ব্যতীত ভারতীয় বংশোদ্ভূত পিতা-মাতার সন্তান নিক্কী হেলি রণধাওয়া এখন উত্তর কেরোলিনা রাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আমেরিকার কোনও প্রদেশের নির্বাচিত প্রথম মহিলা গভর্নর ও দ্বিতীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত গভর্নর।

আর্থিক ক্ষেত্র ঃ

ব্যবসা ও আর্থিক দৃষ্টিতেও পরিশ্রমী ও মেধাবী ভারতীয়গণ বিশ্বে নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। স্টীল কিং নামে খ্যাত লক্ষ্মীনিবাস মিত্তল কয়েক বছর পূর্বে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টীল নির্মাতা কোম্পানী 'আর্সেনাল' ক্রয় করে ঝড় তুলে দিয়েছেন। লক্ষ্মীনিবাস মিত্তল ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনের মধ্যস্থিত সবচেয়ে সুন্দর ও দামী বাড়ীতে বসবাস করেন। শুধু এই নয়, দুনিয়ার আটজন সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে চারজন হিন্দু। এঁরা হলেন লক্ষ্মীনিবাস মিত্তল (৪৫ বিলিয়ন ডলার) মুকেশ আম্বানী (৪৩ বিলিয়ন ডলার), অনিল আম্বানী (৪২ বিলিয়ন ডলার) ও কে পি সিংহ (৩০ বিলিয়ন ডলার)। ভারতের টাটা গোষ্ঠী ইদানীং 'অ্যাংলো ভাব কোরাস স্টীল ফার্ম'-কে ক্রয় করে নিজের কোম্পানীতে পরিণত করেছে, অন্যদিকে টাটা-চা কোম্পানী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠিত চা কোম্পানী 'টেটলী'কে কিনে নিয়েছে। জি-টিভি কোম্পানীর মালিক সুভাষ চন্দ্রার এক কোম্পানী অ্যাঞ্জেল প্যাকেজিং সুইজারল্যাণ্ডের প্রোপেক'কে অধিগ্রহণ করেছে। বিড়লা কোম্পানীর হিণ্ডারলকও অস্ট্রেলিয়ার দুটি তামার খনি- মাউন্টগার্ডেন ও নিফ্‌টি কিনে নিয়েছে। ২০০২ সালেই প্রায় ৪০ টি বিদেশী কোম্পানীকে ভারতীয়রা কিনে নিয়েছে, তারপর থেকে এই সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো ভারতীয় মেধার জয়ঢাক এমন ভাবে বাজছে যে, বিশ্বের মহাশক্তি হবার অহঙ্কারে পূর্ণ ও সারা বিশ্বকে পদানত করতে চলা আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডবল্যু বুশ আমেরিকার ছাত্রদের তাঁর ভাষণে অনেকবার বলেছেন, 'তোমরা পড়াশুনা ঠিকভাবে করো, নাহলে ভারতীয় ছাত্ররা তোমাদের চাকরী ছিনিয়ে নেবে।' তারপরে নির্বাচিত হওয়া বারাক হুসেন ওবামাও ভারতীয় প্রতিভা ও তেজস্বিতায় সন্ত্রস্ত হয়েছেন। এই জন্যই 'আউটসোর্সিং' বন্ধ করা তার প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে একটি। তিনি মাত্র চার বছর বয়সের অজয়পুরীকে মাইক্রোসফট্ ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও ই-মেল করতে দেখেছেন, বালক মুরলী অস্বাটীককে মাত্র তের বছর বয়সে আমেরিকার ডাক্তার হতে দেখেছেন। পনের বছর বয়সের গৌরব রাজা পাই-এর ১০৯৮০ সংখ্যাকে কণ্ঠস্থ করে বিশ্বে অমূল্য কীর্তি স্থাপন করেছেন। সপ্তাদশী কাব্যা বিশ্বনাথনের উপন্যাসকে আমেরিকার বড় চলচিত্র নির্মাতা কোম্পানী ছবি তৈরির জন্য কিনে নিয়েছে। নাসার বৈজ্ঞানিক ও মার্কিন অন্তরীক্ষ যান যা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল তার প্রমুখ সদস্যা স্বর্গীয় কল্পনা চাওলা তো ভারতীয় তরুণীদের নিকট আদর্শস্বরূপা ছিলেনই, তার ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরেও সুনীতা পান্ডা (উইলিয়ামস্) আবার ভারতীয় যুবতীদের সাহস ও জিজীবিষার সঞ্চার করেন। ২০০৬ সালে অন্তরীক্ষে যাতায়াতকারী তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা হয়ে যান। অন্তরীক্ষযানে আরোহন করার সময় তিনি নিজের সাথে শ্রী গণেশমূর্তি, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও তাঁর বাবার লিখিত পত্র নিয়ে গিয়ে সবাইকে এই বার্তা ছিলেন যে, শেষপর্যন্ত ভারতীয় যুবসমাজের প্রতিভা ও প্রগতির ভিত্তিই হলো ভারতের সংস্কৃতি। পেপসী কোলার আন্তর্জাতিক অধ্যক্ষা ইন্দিরা নুয়ি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালী তৃতীয় মহিলা বলে স্বীকৃত।

অনেক বছর লণ্ডনে অবস্থান করে বর্তমানে ভারত সরকারের এক কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত অনিল যোশী প্রবাসী টুডে'র সম্পাদক এবং 'অক্ষরম্'-এর অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ভারতীয়দের তুলনায় ওখানকার (লণ্ডনের) মূল অধিবাসীদের শিশুরা ভাল পারিবারিক পরিবেশ ও পিতা-মাতার সাহচর্য পায় না। এই কারণে ওখানে শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও তথ্য প্রযুক্তির (আই টি)-র ক্ষেত্রে তুলনামূলক- ভাবে ভারতীয় যুবসমাজ অধিক প্রভাবী। প্রবাসী ভারতীয় যুবকরা এজন্যও অধিক উন্নতি করে চলেছে, কেননা পাশ্চাত্য জগতে মুক্ত পরিবেশ, পরিকাঠামোগত সুবিধা ও গবেষণার ব্যাপক ক্ষেত্র পাওয়া যায় এবং ভারতের ন্যায় প্রশাসনিক বাধা ও ভ্রষ্টাচার নেই। তার সাথে তারা পায় পিতা- মাতা ও পরিজনদের স্নেহ এবং ভারতীয় সংস্কার।

(এরপর ১৩ পাতায়)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভা বিশ্বসভায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিভার দ্বারা ভারত বিশ্বগগনে নিজের সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছে। ভারতের সম্মান ও প্রভাব বিশ্ব- মানচিত্রে জ্বল-জ্বল করছে।

এক নাবালক ঘোড়সওয়ারের উপাখ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘোড়ারোগ বলে একটা জিনিস হয়, তা এতদিন জানা ছিল। মূলতঃ ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারুর ঘুমোনোর অভ্যেস থাকলে সেটা ঘোড়ারোগের পর্যায়ভুক্ত হয় বলেই জানা আছে। কিন্তু রাজা-বাদশাদের কাল অতিক্রান্ত হবার পরেও ঘোড়ায় চেপে স্কুলে যাবার বায়নাক্কা কেউ করে থাকলে সেটা ঘোড়ারোগের আওতায় আসবে কিনা তা ডাক্তারের (ঘোড়ার ডাক্তার হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়) এক্তিয়ারভুক্ত। তবে এই ঘোড়ারোগ যে ছোঁয়াচে সেকথা বিলকুল বলা চলে। কারণ ছেলের সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মাও এই রোগে আক্রান্ত। ছেলের নাম চিত্রনাথ দাস। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে বাড়ি।

সময় সকাল ১০টা। স্কুলে যাচ্ছে চিত্রনাথ। সুটেট-বুটেড হয়ে, খাবার-দাবার খেয়ে দিব্যি টাট্টু ঘোড়ায় চেপে রশিদপুর জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে চিত্রনাথ। চারিপাশে অবাক বিস্ময়। এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে না কিরে বাবা! খোঁজ-খোঁজ রবে পাড়ার লোক খুঁজতে লাগলো যতীন্দ্রনাথ-জ্যোৎস্নাকে। যতীন্দ্রনাথ মানে চিত্রনাথের বাবা যতীন্দ্রনাথ দাস। আর জ্যোৎস্না হলো যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী ও চিত্রনাথের মা। পাড়ার লোক হামলে পড়লো— ওইটুকুনি ছেলে! ঘোড়ায় চড়তে আশকারা দিলে কে? যতীন্দ্রনাথবাবু পেশায় জেলে, মানে মৎস্যজীবী আর কি; কাঁচুমাচু মুখে জানালেন, ছেলেকে নিদেনপক্ষে হাত-ঘড়ি কিংবা তাতেও না হলে মোবাইল ফোন দিতেও রাজি ছিলেন তিনি ও ছেলের মা উভয়েই। কিন্তু মায়ের মামারবাড়ি বিহারের মোতিহারিতে গিয়েই নাকি বারোটা বেজেছে, থুড়ি ঘোড়ারোগ ধরেছে চিত্রনাথের। সবে ক্লাস ফাইভের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর মোতিহারিতে বেড়াতে গিয়েছিল সে। সেখানে গিয়েই ঘোড়ার প্রেমে পড়ে যায়। বাড়ি ফিরে এসেই শুরু হয় বায়নাক্কা, বাবা-মায়ের কাছে ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে যাবার আব্দার। ওই যে বললাম, চিত্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মায়ের মধ্যেও তখন সংক্রামক ঘোড়া-রোগ ঢুকে গেছে। ছেলের জন্য তাঁরা শুরু করেন ঘোড়া-খোঁজা (গরু খোঁজার চাইতেও ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সাংঘাতিক বলেই অনুমান)। কোথায় না কোথায় ঘোড়া খুঁজেছেন তাঁরা। হরিশ্চন্দ্রপুর, কুশিদহ, কাটিহার, কুমারগঞ্জ যেখানে যত হাটের সন্ধান পেয়েছেন মাসের পর মাস ঘোড়া খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁরা। অবশেষে মোতিহারি থেকেই ২৫,০০০ টাকা দিয়ে একটা টাট্টু ঘোড়া ছেলের জন্য কিনে আনেন তাঁরা।

অশ্বপৃষ্ঠে চিত্রনাথ।

এই ঘোড়ারোগের ব্যারাম এমনই সংক্রামক যে ঘরে ছোট ছোট দু'টো মেয়ে থাকতেও যতীন্দ্রনাথ-জ্যোৎস্না নিজেদেরই প্রশ্ন করেছিলেন— "আমার ছেলে কেন ঘোড়ায় চড়তে পারবে না?"

যাই বলুন না কেন মশাই, ঘোড়-দৌড়ের নেশা বহু মানুষকে নিঃস্ব করে পথে বসিয়ে দিলেও, স্রেফ ঘোড়ার নেশা মনুষ্যত্বকে রিক্ত করে দিয়েছে, এমন অপবাদ আপনার চরমতম শত্রুও দিতে পারবে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এই ঘোড়া-প্রেম চিত্রনাথ আর তার বাবা-মাকে অন্যরকমের মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই চিত্রনাথ অনায়াসে আজ বলতে পারে— 'সন (টাট্টু ঘোড়াটার এমনই নাম দিয়েছে সে) আমার ভাই; জান এটা? আমি তার সাথে কথা বলি, সে সব বুঝতে পারে।' ঘোড়ায় চড়ে তার স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন পাড়া-প্রতিবেশী থেকে আরম্ভ করে স্কুল শিক্ষিকা পর্যন্ত প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছে সানন্দে। বাড়ি থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ডালিমগাঁও অবধি সনুকে নিয়ে যাবার জন্য চিত্রনাথকে অনুমতি দিয়েছে তার বাবা-মা। চিত্রনাথের দু'চোখে স্বপ্ন সনুকে নিয়ে একদিন সে ঠিক দিল্লী কিংবা কলকাতার মতো বড় কোনও শহরে অবশ্যই পৌঁছে যাবে।

মানুষ যে কেন ঘোড়দৌড়ের পেছনে ছুটে মরে, দৌড় বাদ দিয়ে শুধু ঘোড়ার পেছনে দৌড়লে সর্বস্বান্ত অন্তত হতে হোত না!

শিলচরের সভায় পুরকায়স্থ ভাইদের সঙ্গে সুষমা স্বরাজ।

অসমে বিধানসভা নির্বাচন : একটি বিশ্লেষণ

বাসুদেব পাল

অসমে প্রথম দফার ভোট ৪ এপ্রিল। ওইদিনই হিন্দু নববর্ষ। শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন দলের তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রী নিজ নিজ দলের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রথম দফার ভোটের পরই আগামী বিধানসভার চিত্রটা অনেক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বললে ভুল হবে না। কংগ্রেস এবার রীতিমতো ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে। বিগত ২০০৬ এর নির্বাচনেই কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস ৫৩-তেই ইনিংস শেষ করেছিল। পরে আঞ্চলিক দল বোড়ো পীপুলস ফ্রন্টের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গড়ে।

পাঁচবছর একসঙ্গে 'ঘর' করার পরেও নির্বাচনের মুখে বিপিএফ-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সেই মধুর সম্পর্ক আর নেই। একে অপরের এলাকায় পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ। এর ফলে এবার বহুকোণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন, কোন পক্ষের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা।'

আঞ্চলিক 'বড়ো পীপলস্ ফ্রন্ট' কেবলমাত্র বড়ো অধ্যুষিত দু'তিনটি জেলায় প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে একই কথা প্রযোজ্য ধনকুবের সুগন্ধি ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন আজমলের দল এ আই ইউ ডি এফ সম্বন্ধেও। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রসংস্থা 'অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' এবং পরবর্তী সময়ে 'অসম গণপরিষদ' নামে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে এবং পরে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছিল। আবার অসমে মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারী দল হিসেবে 'অসম মাইনরিটি ফ্রন্ট' ২০০১-এর নির্বাচনে আত্মপ্রকাশ করে। পরে ভাবনা চিন্তা করে অন্যদেরকেও সামিল করে দলকে সেকুলার প্রতিপন্ন করতে এ এউ ডি এফ (অসম ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট) এবং আরও পরে ভারতব্যাপী দলের কাজ বিস্তার করতে 'অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এ আই ইউ ডি এফ) নামে থিতু হয়। বেশকিছু লোভাতুর (অর্থ পদ, প্রতিষ্ঠা) হিন্দু, যার মধ্যে ভট্টাচার্য পদবীধারী প্রাক্তন কংগ্রেসীও আছে— বদরুদ্দিনের দলে সামিল হয়। বিগত লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত অগপ-বিজেপি আঁতাত বর্তমান ছিল। কিন্তু গত বছর অগপ থেকে একদা বিতাড়িত মুখ্যমন্ত্রীত্বকারী প্রফুল্ল মহন্ত অগপ-তে আবারও যোগ দিলে অগপ আগবাড়িয়ে বিজেপির সঙ্গে আঁতাত ভেঙে দেয়। ফলে এবার কংগ্রেসের মতো অগপ এবং বিজেপিও এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এজন্য বহুকেন্দ্রিক লড়াই এবং ভোট ভাগাভাগির সম্ভাবনা প্রবল। ফলে প্রত্যেক দল নিজ নিজ ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি এবং বজায় রাখার ব্যাপারটা গত একবছর থেকে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দলই ভাবছে ভোট কাটাকাটিতে তারাই লাভবান হবেন। দু'দফায় সরকারে থাকার পরও অগপ গত বিধানসভা নির্বাচনে ২৪-এ ঠেকেছিল।

ফলে অগপ-র এবারকার লড়াই বাঁচার ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। জোট ভেঙে যাওয়াতে অগপ'র অনেক নেতা-কর্মী বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্য সর্বানন্দ সোনোয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। অগপ'র উপর চাপ ছিল বিজেপি'র সঙ্গে থাকলে মুসলমান ভোটাররা বিমুখ হবে। ফল কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। অন্যান্যও দল যখন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথায় প্রায় নীরব তখন বিজেপি গত বছর থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে বিজেপি বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেবার দাবীতে সরব। আন্দোলনের ঝাঁজ এতটাই ছিল, যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ '৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ মেনে ধর্মমত নির্বিশেষে বাংলাদেশ থেকে আগত সকলকেই বিদেশী ও অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল; এবার সেই তরুণ গগৈও বাঙালী হিন্দুদের শরণার্থী হিসেবে মান্যতা দিতে নিমরাজী হয়েছেন। আবার মূল অসমীয়াদের কাছেও কংগ্রেস এবং অগপ দলের ভাবমূর্তি ম্লান হয়েছে— গণহারে উলফা ক্যাডারদেরকে (প্রথম সারির) জেল থেকে বের করে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনকে ভিত্তি করেই ছাত্রসংস্থা আসু এবং অসম গণপরিষদ নামক দলটির জন্ম। অথচ দু'বার ক্ষমতায় থেকেও অগপ সরকার বিদেশী বিতাড়নে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। এর

(এরপর ৭ পাতায়)

অসম বিধানসভা— মোট আসন-১২৬
মোট ভোটার—১,৮১,৪৫,৯১৪ জন।
বুথ—২৩৮১৩
প্রথম দফার ভোট—৬২ আসনে ৪ এপ্রিল, ২০১১
দ্বিতীয় দফার ভোট—৬৪ আসনে ১১ এপ্রিল, ২০১১
২০০৬-এ বিধানসভায় দল অনুসারে আসন সংখ্যা কংগ্রেস-৫৩, অগপ-২৪, বিজেপি-১০, এ আই ইউ ডি এফ-১০, সিপিআই (এম) ২, সিপিআই-১, অন্যান্য-২৫

হিন্দুদের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা : 'ডি' ভোটার

এ আই ইউ ডি এফ-এর জনসভায় ভাষণরতা আনোয়ারা তাইমুর, পাশে বসে বদরুদ্দিন আজমল।

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির প্রায় ৩৭ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। এই বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিজেপির ভালই প্রভাব আছে। বিজেপি'র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবার নির্বাচনে সেই বাঙালিদের মন জয় করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গড্‌কড়ি গত মাসে পরপর দু'বার বরাক উপত্যকা সফর করে বাঙালিদের মন স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন।

গত মাসে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা অসমের পর্যবেক্ষক দিগ্বিজয় সিংহ করিমগঞ্জের এক জনসভায় বলে গেছেন, বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে আসা বাঙালি হিন্দুদের শরণার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে না। তাদেরকে বিদেশী বলে বিতাড়ন করতে হবে। এই মন্তব্যের পর ঝড় উঠে রাজ্যের রাজনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বরাক উপত্যকায় গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে গেলেন, বাঙালি হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে বাংলাদেশে, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত। তাদেরকে শরণার্থী হিসাবে গণ্য করে গ্রহণ করা উচিত। দিগ্বিজয় সিংহের মন্তব্যে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। তা মেরামত করার চেষ্টা করেছিলেন তরুণ গগৈ। বিজেপি নেতৃবৃন্দ সেই সুযোগ গ্রহণ করে তড়িঘড়ি সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গড্‌কড়িকে বরাক উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে হিন্দুদের সমর্থনে জনসভা করালেন। করিমগঞ্জের জমিতে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বলি হয়ে যেসব বাঙালি হিন্দু এদেশে আসবে তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তার এই মন্তব্যের পর বরাক উপত্যকায় বাঙালি হিন্দুদের ভোট বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। উৎসাহিত হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। পুনরায় সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গড্‌কড়ি ২৩ মার্চে সেই করিমগঞ্জের জমিতে দাঁড়িয়ে বললেন, বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে আসা বাঙালি হিন্দুদের তাঁরা সরকারকে গ্রহণ করাতে বাধ্য করাবেন। তিনি কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে বলেন, অসমে লক্ষ লক্ষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্রোত অব্যাহত আছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশকারীদের তোষামোদ করে চলছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে দিসপুরে (অসমের রাজধানী) আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হবে একজন বাংলাদেশী। বুধবারের এই বক্তব্যের পর বরাক উপত্যকায় বাঙালি হিন্দুদের ভোট এমনকি বাঙালি মুসলিমদের একাংশ ভোটও বিজেপির ঝুলিতে যাবে বলে বিজেপি পরিষদীয় নেতা মিশনরঞ্জন দাশ করিমগঞ্জ থেকে টেলিফোনে এই দাবী করেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ অবশেষে দিল্লীর অ্যাপেলো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি তার সাংসদ ভাই দ্বীপ গগৈর বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কংগ্রেসের এক মুখপাত্র জানান, দু-চারদিন বাদেই গুয়াহাটি ফিরবেন। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ১২৬টি আসনেই প্রার্থীপদ ঘোষণা করেছে। আগেই বলা হয়েছে এবার রাজ্যে নির্বাচন কমিশন কড়াভাবে নির্বাচনবিধি প্রয়োগ করেছে, এই সর্বপ্রথম নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও এজেন্ট ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটার স্লিপ বিতরণ করবেন। সেই ভোটার স্লিপই ভোটারদের পরিচয়পত্র হিসাবে গণ্য করা হবে। শাসক কংগ্রেস দল এই সুযোগটি নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে বলে বিরোধী দলনেতা প্রফুল্ল কুমার মহন্ত অভিযোগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, স্বাস্থ্য বিভাগের 'আশা' কর্মীদের ভোটার স্লিপ বিতরণের কাজে লাগানোর চক্রান্ত করছে কংগ্রেস। রাজ্যের 'নিউজ লাইভ' নামের এক ব্যক্তিগত টিভি চ্যানেল আছে, যার মালিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। সেই চ্যানেলের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনারের কাছে গুরুতর অভিযোগ করে বলেছেন, একপক্ষীয়ভাবে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে ও বিরোধীদের অপবাদ দিচ্ছে নানাভাবে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনার ওয়াই এস কুরেশী রাজ্যে 'পেড নিউজ' সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের কয়েকটি সংবাদপত্রের দিকেও দৃষ্টি ফেলেছেন। নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ রাজ্যেও বেশকিছু 'পেড নিউজ' সাংবাদিক আছে। বিহারের গত নির্বাচনে ৮৫ জন 'পেড নিউজ' সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। রাজ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটার, তার মধ্যে ৪ লক্ষাধিক 'ডি' ভোটার আছে। 'ডি' ভোটারের অর্থ হচ্ছে ডিসপিউটেড অথবা ডাউটফুল। এই ভোটাররা ১৯৯৭ সাল থেকে ভোট দিতে পারছেন না। রাজ্যের সিংহভাগ বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভোটাররাই হচ্ছে 'ডি' ভোটার। সন্দেহজনক নাগরিক হিসাবে তাদের নামগুলির পাশে 'ডি' চিহ্ন লিখে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া এবং শিলচরের কারাগারের ক্যাম্পে শতাধিক বাঙালিকে আটকে রাখা হয়েছে। বিদেশী শনাক্তকরণ ট্রাইব্যুনালগুলি তাদেরকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের গ্রহণ না করায় সাময়িকভাবে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। রাজ্যের মানবতাবাদী সংগঠনগুলো জোরালো প্রতিবাদ করেছে। তারা দাবী জানিয়েছে আসন্ন নির্বাচনে তাদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার দেবার জন্য। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ বিদেশী শনাক্তকরণ ট্রাইব্যুনালগুলোতে তাদের মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোটাধিকার দেওয়া যাবে না।

কৃষিতে দেশের অগ্রণী রাজ্য গুজরাট

তারক সাহা

রাজ্যের কৃষি অর্থনীতির পিছনে রয়েছে হর্টিকালচার, কার্পাস আর গম এবং এই তিনটি ক্ষেত্রই উপকৃত 'কৃষি মহোৎসবে'র মাধ্যমে। এই মহোৎসবে কেবল কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিচ্ছে না বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

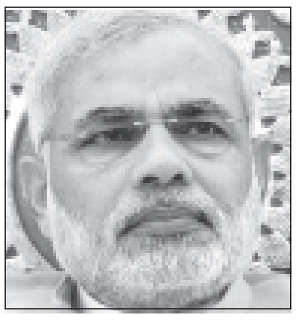

ক্ষেত্রের সমস্যাবলীর চটজলদি সমাধান হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট সেচ প্রকল্পে সহায়তা দিতে জ্যোতিক্রম কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। গুজরাটের কৃষি প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে অংশীদার তার ৫টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মোদী নিজেই বলেছেন কৃষির সার্থক রূপায়ণে গবেষণাগারকে খামারে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে বিজ্ঞানী আর ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

দেশের শীর্ষ উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশে ২০০৫ থেকে ২০০৯— এই চার বছরে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে সাড়ে দশ শতাংশ। কিছু রাজ্যে অবশ্য উন্নয়নের হার দক্ষিণমুখী হয়েছে ওই চার বছরে। এই রাজ্যতালিকায় রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ এমনকি একদা উন্নত রাজ্য হিসেবে গণ্য পাঞ্জাবও। অবশ্য হিমাচলে উন্নয়নের হার ৬.৭ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশী।

দেশের আটটি প্রমুখ রাজ্য তাদের গড় উন্নয়নের হার কমে ৮.৭ শতাংশ নামলেও পাঁচটি রাজ্যে আবার উন্নয়নের হার অল্প বেড়ে হয়েছে ৮.১ শতাংশে। গুজরাট ইতিমধ্যেই তার উন্নয়নের হার চীনের উন্নয়নের হারের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে প্রায় ১২ শতাংশে পৌঁছেছে, তার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা যে কারণ দেখিয়েছেন তাতে রয়েছে শ্রম ও অন্যান্য বাণিজ্য আইনে কড়া নিয়ন্ত্রণ আর সেখানকার সরকারী বহরও যথেষ্ট কম। ২০০২ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা ও ২০০১ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি সামলে ২০০৫-এ দ্বাদশ রাজ্য আয় ২০০৯ সালে সেটি উঠে এসেছে উন্নয়নের তালিকায় মই বেয়ে পাঁচ নম্বরে।

গুজরাটের পর উন্নয়নের নিরীখে আর যে রাজ্যের নাম এক নিঃশ্বাসে নেওয়া যায় তা হল অন্ধ্রপ্রদেশ। ২০০৮-০৯ ভয়ানক খরা সত্ত্বেও উন্নয়নের গড় হার সেখানে সাড়ে নয় শতাংশ। কৃষি রাজ্যের গড় ঘরোয়া উৎপাদনের ৩০ শতাংশ জোগায় রাজ্যের কোষাগারে।

অন্যত্র দেশের একদা উন্নত রাজ্য পাঞ্জাবের উন্নয়নের গতি শ্লথ। ২০০৫ থেকে ২০০৯ এই সময়কালে পাঞ্জাবের উন্নয়নের গতিরথ থমকে গেছে ৬.১ শতাংশ এবং সারা দেশে এর স্থান দ্বাদশে। মধ্যপ্রদেশ ও ওই বছরে আর্থিক গতি নেমে এসেছে বার্ষিক সাড়ে পাঁচ শতাংশে। দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশের আর্থিক গ্রাফ্ পাঞ্জাবের চেয়ে সামান্য ভাল এবং আর্থিক সমীক্ষায় দেখা গেছে তা হলো সাড়ে ছয় শতাংশ। আগামী ২০১২-য় সে রাজ্যে নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর কাছে তাই আর্থিক উন্নয়ন একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্প্রতি ২০১১ সালের আর্থিক স্বাধীনতার সমীক্ষা সারা দেশব্যাপী চালিয়েছিলেন বিবেক দেবরায়, লাভিশ ভাণ্ডারী এবং স্বামীনাথন্ আয়ার প্রমুখ শীর্ষ অর্থনীতিবিদ। তাঁদের সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে ২০০৫ থেকে ২০০৯ এই কালখণ্ডে কার্পাস চাষে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে গুজরাট। দেশে সাকুল্যে যত কার্পাস উৎপন্ন হয় তার ৩০ শতাংশ উৎপন্ন হয় গুজরাটে এবং বাস্তবে চৈনিক ব্যবসায়ীদের কার্পাস সংগ্রহে গুজরাটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য আজ কারুর অজানা নয়।

সারাদেশে গুজরাট শিল্পোন্নত রাজ্য তা আজ সর্বজনবিদিত হলেও, কৃষিতেও যে আজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য তা জানা গেল উক্ত অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষায়। সারা দেশে গত এক দশকে কৃষির গড়পড়তা বৃদ্ধি ৮ শতাংশ হলেও কেবল গুজরাটেই ৯ শতাংশ বৃদ্ধি যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণেরও বেশী। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ এই সময়কালে গুজরাটের কৃষি বাণিজ্যই ৬০ হাজার কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি ৩০ শতাংশেরও বেশি। কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করল নরেন্দ্র মোদীর সরকার?

শিল্পের পর নরেন্দ্র মোদীর নজরে এসেছে কৃষি। গত আট বছরে কৃষিযোগ্য জমি অন্যত্র কমলেও গুজরাটে বেড়েছে নজরকাড়া হারে। এই সময়ে কৃষিযোগ্য জমি ৮৭ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৯৭ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছে। অবশ্য রাজ্যের সব জমিই যে উর্বর বা সর্বত্র যে সেচের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে এমন নয়। এখানে তবে সরকারের ইতিকর্তব্য কী? গত কয়েক বছরে সরকার রাজ্যজুড়ে পাঁচ লক্ষ জল সরবরাহ কেন্দ্র খুলেছে। এগুলি সব ছোট ছোট 'কৃষির পুকুর'। এই সরবরাহ কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে যৌথ সহযোগিতায়।

এর আগে কচ্ছের মতো খরাপ্রবণ এলাকা যে কৃষি ম্যাপের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। জলবন্টনের সুষম ব্যবস্থায় এই অঞ্চল হর্টিকালচার কেন্দ্রে রূপান্তরিত। গত তিন বছরে রাজ্যে হর্টিকালচারের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে ৩০ শতাংশ।

রাজ্যের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের কাছে সরকারের পৌঁছে দেওয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি-পরামর্শ। ২০০৫ সাল থেকে রাজ্যে এক মাস ব্যাপী কৃষি মহোৎসব পালন করছে সরকার। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ১৮ হাজার গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে উন্নত কৃষির পরামর্শ। প্রতি বছর মে মাসে ২৫০ টি কৃষিরথ আর সেই রথের আরোহী রথ পিছু ৫ জন কৃষিবিজ্ঞানী পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের ২২৫টি মহকুমায়। প্রতিটি গ্রামে রথ তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে বিশেষজ্ঞরা উন্নত চাষের ফর্মূলা পেশ করছেন চাষীদের কাছে। আর এতে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে গ্রামবাসীরা। তা সংগঠিত করছে গ্রামসেবক, সরপঞ্চরা যারা কৃষকদের সংগঠিত করে নিয়ে যাচ্ছে ওই রথের কাছে।

অসমে বিধানসভা নির্বাচন

(৬ পাতার পর)

ফলে বিজেপি-ই সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলেই মনে হয়। বিজেপি-র নেতা-কর্মীরা বরাবর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের জমানায় হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

এছাড়াও কংগ্রেস আমলে সীমান্তের শত শত একর ভারত ভূখণ্ড যেমন বাংলাদেশ গ্রাস করেছে তেমনই বাংলাদেশী মুসলমানরা অসমে ঢুকে শাসক দলের ও বেরাদরদের বরদ হাতের কৃপায় হাজার হাজার একর খাসজমি এবং মহন্ত শংকরদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সত্রের জমি দখল করে পাকাপাকি ভাবে বসে পড়েছে। বিজেপি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সরকারকে সত্রের জমি খালি করানোর জন্য আন্দোলন করেছে।

এছাড়া বারবার গুয়াহাটি হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বে তরুণ গগৈর নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নে কোনওরকম গা করেনি। এছাড়া বছরের পর লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে 'ডি'-ভোটার আখ্যা দিয়ে ভোটাধিকারবিহীন করে রাখা হয়েছে। এখানেও প্রতিবাদে মুখর বিজেপি।

সব মিলিয়ে বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দু এবং উজান অসমের অসমীয়া হিন্দুদের একটা বড় অংশের ভোট বিজেপির দিকে যাওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা রয়েছে।

অগপ ও এ আই ইউ ডি এফ-এর কেউই কারও সঙ্গে সমঝোতায় যায়নি। অসমের অনেকগুলি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওই সবক্ষেত্রে এ আই ইউ ডি এফ প্রার্থীরা একচেটিয়া সংখ্যালঘু ভোট পাবেন একথা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। অস্যার্থ-হিন্দু- ভোটের মতোই এবার মুসলিম ভোটও ত্রিধা বিভক্ত হবে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, বিজেপি কোনও সংখ্যালঘু ভোট পাচ্ছে না। বিজেপি যে যথার্থই ভারতীয় মুসলিমদের 'ভোটব্যাঙ্ক' নয়— নাগরিক হিসেবেই দেখে একথা কোনও নতুন নয়। বিজেপি অন্যদের মতোই কেন্দ্রীয় নেতা- নেত্রীদের হেলিকপ্টার ভাড়া করেও প্রচারে নামিয়েছে। গত ২৯ মার্চ গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অসমে সরকার গড়ার দাবী করেছেন বিজেপি নেত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ। তবে ওইদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় করিমগঞ্জে সুষমাজীর কপ্টার ল্যাণ্ড করতে পারেনি। তিনি শিলচরের প্রার্থী রাজদীপ রায়ের হয়ে সভা করেছেন। ঠিক নির্বাচনের মুখে কংগ্রেস ছেড়ে এ আই ইউ ডি এফ-এ ভিড়েছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আনোয়ারা তাইমুর। তিনি আজমলের সঙ্গে চুটিয়ে জনসভা করে চলেছেন সংখ্যালঘু বহুল এলাকায়। এতসব বিচার বিশ্লেষণ, যোগ-বিয়োগ সত্ত্বেও বিজেপির পক্ষে বাজি ধরা যাচ্ছে না। কারণ আকাশে চক্কর কাটছে হেলিকপ্টার আর বাতাসে উড়ছে টাকা।

সেই টাকা দিয়ে বিধায়কদের ভোট কিনে তরুণ গগৈ বিরোধী সবকটি দল থেকেই সমর্থন আদায় করে অসম্ভকে সম্ভব করে তাঁর দলের রাজ্যসভার প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে এনেছিলেন। বিজেপি দলের বিধায়ক রুমি নাথ এবং কার্তিক সেনা সিন্‌হাও কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। এবার রুমি কাছাড়ের বড়খলা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী। দল যথারীতি তাদেরকে বহিষ্কার করেছিল। গতবার যাঁকে হারিয়ে রুমি ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছিলেন সেই সময়কার কংগ্রেসী মন্ত্রী মিসবাহুল ইসলাম এবার নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রুমির দিসপুর বিধানসভায় ঢোকা আটকাতে।

হ্যাং অ্যাসেম্ব্লি হওয়ার পথে বড় বাধা সেই টাকা। গতবার ১২৬ আসন বিশিষ্ট অসম বিধানসভার ২০০৬-এর নির্বাচনে ২২ জন কোটিপতি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবার সেই সংখ্যাটা পঞ্চাশ-এ পৌঁছেছে। প্রথম কুড়িজন ধনাঢ্য কোটিপতি প্রার্থীর মধ্যে বিজেপি'র একজনও নেই। এবার ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমল সাংসদ হওয়ার সুবাদে প্রার্থী হননি। ফলে কংগ্রেস প্রার্থী অঞ্জন দত্তই প্রার্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী। সুতরাং টাকার জোরে গগৈ-এর হ্যাটট্রিক হলে এবং প্রয়াত বি পি চালিহার রেকর্ড স্পর্শ করলে তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই।

নির্বাচনী সমীক্ষা বা ট্রেন্ড 'হ্যাং' অ্যাসেম্বলি। সেক্ষেত্রে বিজেপি-ই কিং-মেকার-এর ভূমিকা নিতে চলেছে।

রামনবমী প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী-ই রামনবমী নামে প্রসিদ্ধ। কত হাজার বছর আগে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছিলেন! সেই দিনটি এখনও ভারত এবং বহির্ভারতেও বিশ্বাসীরা পালন করে আসছে। 'জন্মেছিলেন' শব্দটি নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিতর্ক চলে আসছে। একদল বলেন রাম জন্মেছিলেন আদিকবি বাল্মিকীর কবি- কল্পনায়। অন্যদল বলেন রামচরিত্র যুগ যুগ বাহিত লোককথা নানা কাহিনীর মিশ্রিত একটি রূপ, যাঁকে বাল্মিকী তাঁর মহাকাব্যে বিন্যস্ত করেছেন। আর একদল যারা অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অবতারবাদে বিশ্বাসী ভক্ত, তাঁরা রামকে একান্তভাবে দেহধারী মানুষ বলেই মনে করে। তারা বলে— দশরথের রাণী কৌশল্যার গর্ভে রামের জন্ম হয়েছিল। এর সঙ্গে এটাও সত্য বলে মনে করে যে যুগ প্রয়োজনে দেবতা নরদেহ ধারণ করে মর্তে অবতরণ করেছেন। যতদূর মনে হয় এটাই বাস্তব সত্য। কবি এই সত্যকাহিনীটিকে ছন্দে আবদ্ধ করে রামায়ণ রচনা করেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই পবিত্র রামকথা কতভাবে যে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে কাহিনীর চরিত্রগুলির নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার হিসেব নাই। এমন কি বিভিন্ন চরিত্রের সম্পর্কও বদলে গেছে কোথায় কোথাও। চলমানতার স্বাভাবিক নিয়মই হলো নিয়ত পরিবর্তিত হওয়া। এখানে রাম কাহিনী যথাযথ রেখেই পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন বাঙালীর হাতের কাছে আছেন কৃত্তিবাস। বিশ্বাসী বাঙালী কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করে রামের কথা শোনে এবং বিশ্বাস করে। একটু দূরে আছেন গোস্বামী তুলসীদাস। তাঁর রামচরিত মানসে তাঁর বিশ্বাসমত রামকে দেখিয়েছেন। তুলসী দাসের অগণিত অনুসারী তাঁকেই বিশ্বাস করে। দুটি গ্রন্থের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কিছু পার্থক্য আছে। কৃত্তিবাস বাল্মিকীর রাম সীতাসহ অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের কিছু রঙ ধরিয়েছেন, তুলসীদাস একই চরিত্র অবলম্বন করে ভিন্ন ধরনের স্বাদ বিতরণ করেছেন।

এখানে কেবল 'রামনবমী' প্রসঙ্গটি ধরা যাক্। কৃত্তিবাস যিনি আগে কবি। মধ্যযুগীয় ভক্তির হাওয়া তাঁর গায়ে লেগেছে মাত্র। তিনি বলেছেন—

মধু চৈত্র মাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী।।
গর্ভব্যথা নাহি পায় নাহিক শোণিত।
শুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত।।

তার আগে বলেছেন— ''শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে''। অবতারবাদে বিশ্বাসী কৃত্তিবাস জগৎস্বামীর অবতরণের সময় কোনও ক্লেদ বা মলিনতার বিবরণ দিলেন না এমন কি গর্ভযন্ত্রণার কথাও অস্বীকার করলেন।

গোস্বামী তুলসীদাস যিনি আগে ভক্ত পরে কবি, তিনি বলেছেন—

নৌমী তিথি মধুমাস পুনিতা,
সুকল পচ্ছ অভিজিত হরি প্রীতা

আরও কয়েকটি শ্লোক আছে এর পরে যাতে প্রস্তুতি সহ দেবতারাও প্রীত হয়ে উঠেছেন। বলেছেন—

'ভয়ে প্রগট কৃপালা দীন দয়ালা
কৌশল্যা হিতকারী''

ভক্ত তুলসীদাসের কৌশল্যা বলছেন—

'কহ দুই কর জোরী অস্তুতি কেঁহি বিধি করেঁ অনন্তা। বেশী বিস্তারের প্রয়োজন নাই। জন্ম প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায় সমকালের দুই কবি দুই ধারায় বর্ণনা করেছেন। অতএব বহুযুগ ধরে প্রবহমান রাম কথায় প্রচুর আখ্যান উপাখ্যান যুক্ত হবে স্থান বিশেষে পার্থক্য হয়ে যাবে কাহিনীর বুননে। কিন্তু মূলসূত্র যা বাল্মিকী কৃত, নারদ কথিত এবং ব্রহ্মা সমর্থিত তা ঠিকই আছে। অন্তত খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না।

রামনবমীর পুণ্যক্ষণে বাল্মিকী রামায়ণ রচনার কথা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে। মূল রামায়ণের প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ করলে দেখা যায়, দেবর্ষি নারদ এসেছেন বাল্মিকীর আশ্রমে। বাল্মিকী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সসম্মানে আসনে বসিয়ে চারটি শ্লোকে একটি প্রশ্ন রাখলেন। যার সারার্থ হলো— পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান গুণবান মহাবল পরাক্রান্ত ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সকল প্রাণীর হিতাসাধক, সুচতুর প্রিয়দর্শন ইত্যাদি গুণসম্পন্ন। এমন একজন মানুষ তাঁকে দেখলে দেবতারাও ভয় পান?

উত্তরে নারদ বললেন—

'ইক্ষ্বাকু বংশ প্রভবো রামো নাম জনৈ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান ধৃতিমান বশী।।

অর্থাৎ রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিখ্যাত নরপতি আছেন, যিনি নিয়তাত্মা বীর্যবান দ্যুতিমান ও ধৃতিমান। যিনি স্ববশে থাকেন এবং অন্য সকলে তাঁর বশীভূত। এরপরে বাল্মিকী রামায়ণের প্রথম সর্গ শেষ করেছেন সংক্ষিপ্ত রামায়ণ কাহিনী বলে।

কাহিনী শোনার পরও কবিচিত্তে কবিতার অভ্যুদয় ঘটেনি। তিনি তমসানদীর তীরে শিষ্যবর্গ সহ স্নান আহ্নিকের জন্য এসেছেন। সেখানেই দেখলেন ক্রৌঞ্চ মিথুণের ক্রৌঞ্চকে ব্যাধের তীরে নিহত হতে। সেই মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য দেখে আদি কবি বাল্মিকীর মুখ দিয়ে আদি কবিতা নির্গত হলো ''মা নিষাদ...ইত্যাদি শোক থেকে উদ্ভুত বলে কবি এর নাম দিলেন শ্লোক। কিন্তু কবি ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে যে নূতন বস্তুর সৃষ্টি হলো তাকে নিয়ে তিনি কি করবেন।

এসময় স্বয়ং ব্রহ্মা এসে কুশল বিনিময়ের পর বললেন দেবর্ষি নারদের কাছে যে কাহিনী শুনেছ সেই রামকাহিনী তুমি এই শ্লোকের দ্বারাই রচনা কর। আমার সংকল্প প্রভাব এবং তোমার তপস্যা প্রভাব মিলিত হয়ে তোমার যা অবিদিত আছে— কাব্য রচনার সময় তাও ধরা পড়বে।

নারদ এবং ব্রহ্মা উভয়েই শ্রীরামের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বাল্মীকী জেনেছেন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন অযোধ্যাপতি দশরথ পত্নী কৌশল্যার গর্ভে। এর জন্য বাল্মিকীকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

এবার আমরা বাল্মিকী কৃত রামায়ণে কথিত জন্মক্ষণটি উদ্ধৃত করব। বাল্মিকী বলছেন—

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ,
নক্ষত্রে র্যদিতি দৈবস্যে সোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতি বিন্দুসাসহ

সামান্য ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ করলে দাঁড়ায়— দ্বাদশ মাস পূর্ণ হলে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে রবি মঙ্গল শনি শুক্র ও বুধ এই পাঁচটি গ্রহ শেষ মকর তুলা কর্কট ও মীন রাশিতে সঞ্চারিত হলে এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সঙ্গে কর্কট রাশিতে উদয় হওয়ার ক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। লক্ষ্যণীয় যে এই বর্ণনার মধ্যে কৃত্তিবাসের অলৌকিকতা এবং তুলসীদাসের ভক্তি মহিমা প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা জ্যোতিষ চর্চা করবেন তাঁরাই বুঝবেন নারদ কথিত শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী এই ক্ষণে জন্ম হওয়ার ফলেই সম্ভব। তাছাড়া রাম-কথা বাল্মিকী শুনেছেন নারদের মুখ থেকে ওপর ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে রামচন্দ্র তখনও বর্তমান ''রামো রাজাসুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রজাস্যতি'' ইত্যাদি শ্লোকে ভবিষ্যতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সংবাদ বলা হয়েছে।

রামচন্দ্রের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর সহস্রযুগ কেটে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মানবদেহ সংবরণ করেছেন। এখন ভক্তের হৃদয়ে নানা ভাবে মূর্ত হচ্ছেন তিনি। তাঁর মূল কেন্দ্রটি যে মানবরূপী মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম তাকে অস্বীকার করব কেন?

বাল্মিকী কাব্যের আকারে ইতিহাস লিখেছেন। একথা অস্বীকার করলে সমগ্র ভারত সংস্কৃতিকেই অস্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে রামায়ণ প্রসঙ্গে বলেছেন— ''রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে— ভারতবর্ষের যারা সাধনা যাহা আরাধনা যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস''। বাল্মিকী কাব্যে ইতিহাস রচনা করেছেন। পাশ্চাত্যানুসারী হয়নি বলে অন্য কোনও ধরনের ইতিহাস লেখা হতে পারে না এটা ভাবাও সংগত নয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনায় শ্রীরাম ও রামলালা

মদনমোহন সিংহ

কথামৃতে ঠাকুরের কাছে জনৈক ভক্ত ঈশ্বর নির্ভরতার ঘটনা এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, এক অত্যন্ত সৎ তাঁতী ছিল। সে কাপড় বাজারে নিয়ে যেত বিক্রির উদ্দেশ্যে, ক্রেতা তাকে কাপড়ের দাম জানতে চাইলে সে ব'লত রামের ইচ্ছায় সুতোর দাম এত। রামের ইচ্ছায় বুননের দাম এত, রামের ইচ্ছায় বহন খরচ এত। রামের ইচ্ছায় পারিশ্রমিক এত, অতএব কাপড়ের মূল্য এত। উক্ত তাঁতী রোজ কাজ শেষ করে অবসর সময়ে পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন। একদিন এক ডাকাতের দল ডাকাতি করে তাদের মালপত্তর বস্তা ওই চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তাঁতীর মাথায় তুলে দেয় আর তাকে ডাকাতাদের সাথে চলতে বাধ্য করে এই অবস্থায় চৌকিদার চলে আসায় ডাকাত দল পালিয়ে যায়। কিন্তু ধরা পড়ে এই সত্যবাদী তাঁতী। পরে এই সত্যবাদী তাঁতী যাকে আপাত দৃষ্টিতে বোকা বলে মনে হয়। এই সত্যাশ্রয়ী তাঁতীকে কোর্টে তোলা হলে বিচারক তার চুরি করার হেতু জানতে চাইলে সে একে একে সবিস্তারে বলতে থাকল রামের ইচ্ছায় ডাকাত দলের তার মাথায় বোঝা চাপানো, রামের ইচ্ছায় আদালতে আগমন। জজ তার কথা শুনে বুঝতে পারলেন, এ চোর নয় এ সত্যাশ্রয়ী। তখন তাকে মুক্তি দিলে সে মন্তব্য করে যে রামের ইচ্ছাতেই সে জেল থেকে ছাড়া পেল অর্থাৎ রামে নির্ভরতা যে তার কি অপরিসীম তা বোঝা যায় উক্ত ঘটনা থেকে।

বর্তমানে রাম জন্মভূমি বা রামমন্দির নিয়ে আইন আদালত থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবার মনে নানান প্রশ্ন যে রাম ঐতিহাসিক পুরুষ নাকি কাল্পনিক? যদি আমরা বিশ্বাস করি যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, উত্তর ভারত থেকে রামায়েত সম্প্রদায়ের এক সাধু বালকরাম বা রামলালা সাধনভজন করতেন এবং ভগবানরামকে বালক রূপে দেখতে পেতেন ও তার সেবা করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে একটি বালক রামের ধাতব মূর্তি নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসেন তখন ঠাকুর বালক রামের মূর্তি দেখেন শুধু তাই নয় সেই বালক রাম ঠাকুর স্নান করতে গেলে তাঁর সাথে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় বেশী

সাঁতার দেওয়া এবং এতে ঠাকুর তার সর্দি লেগে শরীর খারাপ করে বলে জল ঘাঁটতে নিষেধ করা এবং অবাধ্য বালকের ন্যায় ঠাকুরের কথায় কর্ণপাত না করে ঝাঁপাই শুনলে ঠাকুর কখনও সেই বালক রামকে জলে চুবিয়ে পরে নিজে মাতা কৌশল্যার ন্যায় অশ্রুপাত করেছেন। কখনও বা প্রভু রাম বালক রামচন্দ্রকে খই খাইয়ে কষ্ট পেয়ে বলেছেন যে মা কৌশলা যে মুখে ক্ষীর ননী খাইয়ে দিতেন সেই মুখে ধেনো খই খাইয়ে ঠাকুরের বিলাপ— এ যেন স্নেহবৎসলা সুলভ মায়ের ন্যায় বালক রামের মঙ্গল চিন্তায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিনরাত বিভোর। পরবর্তীকালে আমরা আরও দেখি যে বালক রাম তার দীর্ঘদিনের সেবক রামায়েত সম্প্রদায়ের উত্তর ভারতের সাধু জটাধারীর সাথে আর ফিরে যেতে চাইলেন না এবং পরে জটাধারী সাধু-বালক রামের জেদের কাছে হার মেনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে তার বালক রামকে দিয়ে বলে যান এইভাবে রামের দর্শন ও তার সেবা ঠাকুর নিজে করেছেন। এ দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বলা যায় যে ভগবান রামচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ।

দ্বিতীয়ত ভগবান রামকৃষ্ণ বালক অবস্থায় পিতা ক্ষুদিরামের কাছ থেকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এবং রঘুবীর শিলা তার পিতৃদেবের অত্যন্ত আরাধ্য ও জাগ্রত দেবতা যা আজও পূজিত হয়ে আসছে কামারপুকুরে।

এ ভিন্ন পঞ্চবটীতে ঠাকুরের একদিন সীতাদেবী দর্শন তার বর্ণনায় এরূপ। দাস্যভক্তি সাধনকালে ''এই কালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসে আছি। ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে অমনি বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ওই মূর্তিটিকেই যে তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে। পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়ন সম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম দুঃখ করুণা সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ওই দেবী মানবী ধীর ও মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছে কে ইনি? এমন সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল সীতা, জনমদুঃখিনী সীতা, জনকরাজ নন্দিনী সীতা, রামময় জীবিতা সীতা। তখন মা মা বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপাতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর

(এরপর ১৩ পাতায়)

বঙ্গাব্দের বয়স ও প্রবর্তক

রাজকুমার জাজোদিয়া

বর্তমানে বাংলা নববর্ষ সাধারণত ১৪ বা ১৫ এপ্রিলে হয়। এখন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ চলছে। প্রথম মতানুযায়ী সম্রাট আকবরের সময় ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরী সালে বাংলা সালের সূচনা হয়েছিল। ৯৬৩- কে ভিত্তি করে বঙ্গাব্দের সূচনা হয়। সহজ কথায় সূচনাতেই বাংলা সালের বয়স ছিল ৯৬৩ বছর। এই সূত্র ধরলে ১৪১৮ বঙ্গাব্দের বয়স হবে (১৪১৮ — ৯৬৩) ৪৫৫ বছর। অর্থাৎ বঙ্গাব্দের প্রাচীনতা বা বয়স হচ্ছে মাত্র ৪৫৫ বছর। দ্বিতীয় মতানুযায়ী, বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল গৌড়বঙ্গের মহারাজা শশাঙ্কের আমলে। বঙ্গাব্দের সূচনাকালে ১-১-১ (প্রথমদিন—প্রথমমাস —প্রথম বছর) ধরলে ১৪১৮ বঙ্গাব্দের বয়স হচ্ছে ১৪১৫ বছর। উভয় মতের মধ্যে ফারাক হচ্ছে, ১৪১৮ — ৪৫৫= ৯৬৩ বছর। যাই হোক, বিষয়টি সরল-সহজ গণিতের মাধ্যমে বিচার করা দরকার। বাংলা সালের এক বছরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিন অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের সঙ্গে কিছু সময়। আবার সর্বাধুনিক বিজ্ঞান মতে এক বছরের কাল দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩৬৫.২৪২২০০ দিন। দুই কালদৈর্ঘ্যের মধ্যে ফারাক হচ্ছে .০১৬৫৫৬ দিন। গণনা পদ্ধতির সামান্য ভুলের জন্য বাংলা সাল প্রতি বছর .০১৬৫৫৬ দিন এগিয়ে চলছে। এভাবে ১৪১৬ বছরে (১৪১৬ × .০১৬৫৫৬) ২৩.৪৪ বা ২৪ দিন এগিয়ে গেছে। প্রকৃত সূচনা তারিখ বের করতে হলে বর্তমান নববর্ষের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ দিন পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে গেলে আমরা পৌঁছে যাব ২২ মার্চ। ২২ মার্চের আগের দিন হচ্ছে ২১ মার্চ। এই ২১ মার্চ হচ্ছে বাসন্তি বিষুবের দিন। এই বিষুবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, দিন আর রাত সমান হয়। অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন আর ১২ ঘণ্টা রাত। বাসন্তী বিষুবের পরের দিন থেকে সৌর বাংলা সালের গণনা শুরু হওয়াই ছিল এক গাণিতিক ঘটনা।

বর্তমান ইংরেজি সাল ২০১১ থেকে বাংলা সাল ১৪১৮ বিয়োগ করলে ৫৯৩ বছর দাঁড়ায়। অর্থাৎ ৫৯৩ বয়স্ক খৃস্টাব্দকে সংখ্যার ভাষায় ৫৯৪ খৃস্টাব্দ লিখতে হবে। কারণ যে কোনও অব্দের সূচনা শূন্য দিয়ে হয় না, শুরু হয় ১ সংখ্যা দিয়ে। এটা প্রমাণিত সত্য। খৃস্টাব্দের বর্তমান গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল বিষুবের পরের দিন অর্থাৎ ২২-৩-৫৯৪ খৃস্টাব্দে বা ১-১-১ বঙ্গাব্দে। বিষয়টি আরও সহজভাবে লেখা যায়। মোটামুটি প্রতি ৬০ বছরে (৬০× .০১৬৫৫৬) .৯৯ বা ১ দিন এগিয়ে যায়। বিষয়টি নিম্নভাবে লেখা যায়। লিপইয়ার এবং অতি সূক্ষ্মতার অভাবে নববর্ষ একদিনের হেরফের হতে পারে (সারণী দ্রষ্টব্য)। আমরা জানি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সাল ছিল ১৮৬১ খৃস্টাব্দ বা ১২৬৮ বঙ্গাব্দ এবং ওই বছর বাংলা নববর্ষ হয়েছিল ১২ এপ্রিল (এই তথ্য উপরোক্ত তালিকার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে)।

আবার আমরা প্রথত মতে ফিরে আসি। এই মতানুযায়ী বঙ্গাব্দের বয়স ৪৫৪ বছরে (৪৫৪ × .০১৬৫৫৬) ৭.৫১ অর্থাৎ ৭ বা ৮ দিন পিছিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পিছিয়ে যেতে হবে ২৪ দিন। ৪৫৪ বছরে সম্ভব নয়। সম্ভব ১৪১৬ বছরে। সুতরাং ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে বঙ্গাব্দের সূচনা হতে পারে না। সূচনা হয়েছিল, প্রথম বাংলা সালের প্রথম মাসের প্রথমদিনে অর্থাৎ ১-১-১ হিসেবে। মজার কথা, সামান্য ভুলটির (.০১৬৫৫৬) মধ্যে লুকিয়ে আছে বঙ্গাব্দের সূচনা কাল।

এখন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, বঙ্গাব্দের সঙ্গে সম্রাট আকবরের নাম কীভাবে জড়িত হল? বিষয়টি নিয়ে কিছু ভাবা যাক। আমরা জানি হিজরী সালের সূচনা হয়েছিল ৬২২ খৃস্টাব্দে। বঙ্গাব্দের মিলে যাওয়ার জন্য অনেকে মনে করেন বঙ্গাব্দের সূচনা আকবরের সময় শুরু হয়েছিল। এছাড়া হিজরী চান্দ্রমাস হিসেবে গণনা হওয়ায় ঋতুর সঙ্গে মিল হচ্ছিল না। তাই সৌরমাসের বঙ্গাব্দ হিসেবে খাজনা আদায়ের নিয়ম চালু হতে পারে। খাজনা আদায়ের নতুন নিয়মের জন্য বঙ্গাব্দ এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

সারণী

বঙ্গাব্দ		খৃস্টাব্দ		নববর্ষের ইং তারিখ
১—৬০		৫৯৪—৬৫৪		২২ মার্চ
৬১—১২০		৬৫৫—৭১৪		২৩ মার্চ
১২১—১৮০		৭১৫—৭৭৪		২৪ মার্চ
১৮১—২৪০		৭৭৫—৮৩৪		২৫ মার্চ
		এভাবে চললে		
৯৬১—৯৬৩—১০২০	=	১৫৫৫—১৫৫৬—১৬১৪	=	৭ এপ্রিল
১০২১—১০৮০	=	১৬১৫—১৬৭৪	=	৮ এপ্রিল
		এভাবে চললে		
১২৬১—১২৬৮—১৩২০	=	১৮৫৫—১৮৬১—১৯১৪	=	১২ এপ্রিল
১৩২১—১৩৮০	=	১৯১৫—১৯৭৪	=	১৩ এপ্রিল
১৩৮১—১৪৪০	=	১৯৭৫—২০৩৪	=	১৪ এপ্রিল
১৪৪১—১৫০০	=	২০৩৫—২০৯৪	=	১৫ এপ্রিল
১৫০১—১৫৬১	=	২০৯৫—২১৫৪	=	১৬ এপ্রিল

(৬২২ — ৫৯৪) ২৮ বছর পরে। হিজরী বছরের কালদৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫৪ দিন (চান্দ্র বছর হিসেবে) ধরে ফেলে। অর্থাৎ বঙ্গাব্দের ক্রমিক সংখ্যা যখন ৯৬৩ হিজরী বঙ্গাব্দকে (সৌর বছর হিসেবে) ধরে ফেলে। অর্থাৎ বঙ্গাব্দের ক্রমিকসংখ্যা যখন ৯৬৩ তখন হিজরীর ক্রমিক সংখ্যা ছিল ১৫৫৬। এই বছরেই আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রূপ এই সূত্র ধরে আকবরের নাম বঙ্গাব্দের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। উল্লেখ্য, বঙ্গাব্দ সৌর অব্দ হওয়ায় হিন্দু সমাজের বেশ কিছু পুজো ও উৎসব বঙ্গাব্দের মাস হিসেবে সারা ভারত জুড়ে পালিত হয়। যেমন—সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি বাংলা পৌষ সংক্রান্তিতে পালিত হয় সারা ভারতে। এছাড়া বিশ্বকর্মা পুজো হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। শুভ বিবাহে সূর্যের অবস্থান বিচার করা হয়। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণভাবে সর্বভারতীয় সৌরবছরে কোনও ক্রমিক সংখ্যা বসানো হয়নি। এই ক্রমিক সংখ্যা বসানোর কাজ হয় বঙ্গদেশে যতদূর সম্ভব এই কাজ করেন গৌড়বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ক, তাঁর রাজ্য অভিষেকের সময়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ভারত কোষ থেকেও জানা যায়, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে শশাঙ্ক বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা হন। বলার তাৎপর্য হচ্ছে ৫৯৪ খৃস্টাব্দে শশাঙ্কের অভিষেক ও সৌরসালের সূচনা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকেই হয়েছিল। কিছু লক্ষ্য করলে জানা যাবে, বাংলা সালের শেষের দিন চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ প্রাক নববর্ষে হয় চড়ক পুজো অর্থাৎ শিবের আরাধনা। এই উৎসব শৈব শশাঙ্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, যীশুখৃস্ট সম্পর্কিত অব্দের নাম খৃস্টাব্দ হলে শশাঙ্ক প্রবর্তিত অব্দ শশাঙ্কাব্দ হলো না কেন? এর উত্তরে বলতে হয়, শশাঙ্ক বাংলার ইতিহাসে এসেছিলেন এক ধূমকেতুর মতো, উত্তরাধিকারীরাও টিকে থাকতে পারেননি। স্বল্পকালের জন্য শশাঙ্কাব্দ কথাটি লোপ হয়ে যায়। পরিবর্তিত হয়ে যায় দেশবাচক বঙ্গাব্দ রূপে। যেমন আমরা অনেক সময় খৃস্টাব্দকে ইংরেজি সাল বা ইংরেজি তারিখ বলে থাকি। ইংরেজি বলতেই ইংল্যাণ্ড। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি সম্পর্কিত অব্দ দেশ সম্পর্কিত হইতেই পারে। এটা ঠিক যে ইতিহাসে প্রত্যক্ষভাবে শশাঙ্ককে বাংলা সালের সূচনাকারী বলা হয়নি, তবে পরোক্ষভাবে তাঁরই কথা উঠে আসে। ইতিহাসে লিখিত প্রমাণের অভাবে যুক্তি-বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। যুক্তি-বিজ্ঞান প্রাচীন বাংলার শশাঙ্কেরই কথা বলে।

ত্রিপুরাব্দ (ত্রিং) নিয়ে বিভ্রান্তি

জহর আচার্য

রাজমালা নিয়ে পাঠক সমাজে বিভ্রান্তি দীর্ঘদিনের। পক্ষান্তরে ত্রিপুরাব্দ নিয়ে বিভ্রান্তি আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে। কারণ তখন থেকে কিছু উৎসাহী যুবক আবিষ্কার করলেন যে, ত্রিপুরাব্দের উৎপত্তি হয়েছিল ৫৯০ খৃস্টাব্দে এবং এ অব্দের শেষ দিনটি ছিল ২১ ডিসেম্বর এবং ত্রিপুরাব্দের পয়লা দিনটি ছিল ২২ ডিসেম্বর দিনটি 'ত্রিং উৎসব' নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক এক বছর এক এক জায়গায় পালন করে আসছেন। এ ব্যাপারে কিছু লেখকের সহজ হিসেবটা হল, ২০১০ খৃস্টাব্দ— ১৪২০ ত্রিং : = ৫৯০ খৃস্টাব্দ ত্রিপুরাব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন জুঝারো ফা (যুঝার ফা) নাকি ৫৯০ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশ (গঙ্গার পশ্চিম পর্যন্ত) জয় করে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেছিলেন। এ দুটো ধারণাই ইতিহাসসম্মত নয় এবং অলীক কল্পনা মাত্র। ষষ্ঠ শতকের ইতিহাস চর্চা করলে এর অসারতা প্রমাণ হয়। জুঝারো-ফার বঙ্গদেশ জয়ের কোনও ঘটনা ইতিহাসে নেই। রাজমালার বংশ তালিকা কিংবা তালিকায় জুঝারো ফাকে রত্নমাণিক্যের (১৪৬৪ খৃস্টাব্দ) মাত্র পাঁচ-ছয় পুরুষ আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই তথাকথিত জুঝারো ফা (জুঝারু ফা) ৫৯০ খৃস্টাব্দের রাজপুরুষ হতেই পারেন না। তাছাড়া তুইপ্রা সম্প্রদায় বর্তমান ত্রিপুরায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এসেছেন বলে এমন কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের হিসেবেও দেখা যায়, বোড়ো ভাষার সঙ্গে ককবরক ভাষার ছাড়াছাড়ি মোটামুটিভাবে ছয়-সাতশ বৎসরের ব্যাপার।

রাজামালায় জুঝারো ফার রাঙামাটি জয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, "ভঙ্গ দিল লিকা রাজা ছাড়ি নিজ দেশ/জুঝার নৃপতি তথা হইল নরেশ"। যাই হোক, সে রাঙামাটির জয় কিন্তু বর্তমান অমরপুরের পার্শ্ববর্তী স্থান। পরে রত্নমাণিক্য 'রত্নপুর' (বর্তমান উদয়পুর) জয় করে নিতে নিজ নামে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় লেখা হয়েছে "শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা আর মঠ ছিল/রত্নপুরে চতুর্দশ দেবতা স্থাপিল।" প্রকৃতপক্ষে রত্নমাণিক্য (১৪৬৪ খৃস্টাব্দ) থেকেই ত্রিপুরায় মাণিক্য রাজবংশের শাসন আরম্ভ হয় এবং সে সময় থেকে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় শকাব্দই ব্যবহার করে উদারতার পরিচয় রেখেছিলেন। তখন তাঁদের নিজস্ব অব্দ থাকলে অবশ্যই তা ব্যবহার করতেন।

যাই হোক, 'ত্রিং' ত্রিপুরাব্দের সংক্ষেপ নাম। এটা কোনও পার্বণ বা উৎসবের নাম নয়। এটা কোনও সামাজিক পার্বণও নয়। রাজ আমলে অনেক সময় তিপ্রা সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ব্যক্তি নামের পরে 'ত্রিং' শব্দও ব্যবহার করতেন উপাধি অর্থে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে ১৭৯১ শকাব্দে এবং ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দে (অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে) তাঁর মুদ্রায় প্রথম 'ত্রিপুরাব্দ' (ত্রিং) ব্যবহার করেন। তাঁর পূর্ববর্তী ত্রিপুরার সমস্ত মাণিক্য রাজাই তাঁদের প্রবর্তিত মুদ্রায় শকাব্দই ব্যবহার করেছিলেন। বীরচন্দ্র প্রথম ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরবর্তী তিনজন রাজা এবং একজন রিজেন্ট মহারাণী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরাব্দই ব্যবহার

বীরচন্দ্র মানিক্য

করেছেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্বে কোথাও ত্রিপুরাব্দ বা ত্রিং শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ত্রিপুরাব্দ যেমন ৫৯০ খৃস্টাব্দে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি বঙ্গাব্দও ৫৯৩ খৃস্টাব্দে সৃষ্টি হয়নি। এক্ষেত্রে 'হিজরী চান্দ্র' এবং সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সৌর তথা 'ফসলি অব্দের' কথা মনে রাখতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃস্টাব্দ) আদেশে প্রবর্তিত এক নূতন গণনাক্রম চালু হয়েছিল। আকবর নিজে মুসলমান হলেও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারায় হিজরি অব্দ ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ রাজস্ব আদায়, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিজরি অব্দ ব্যবহারে নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দিত। অন্যদিকে আকবর রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সম্ভবত, 'হিজরি অব্দ' এবং 'ফসলি অব্দের' প্রয়োগের কারণেই বঙ্গাব্দের সঙ্গে ত্রিপুরাব্দের তিন বছরের ফারাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া রাজা বলে কথা, সুতরাং রাজার সনটা একটু এগিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। যাই হোক, বঙ্গাব্দের প্রকৃত প্রয়োগের সময় হলো সপ্তদশ শতাব্দীতে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা সময় সময় নিজেদের মনগড়া একটা অব্দ প্রয়োগ করতেন। অবশ্য এগুলোর স্থায়িত্ব হয়নি। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রাজারা তাঁদের নিজস্ব অব্দ তৈরী করলেও সেটি সৌর হিজরি অব্দ তথতা ফসলি অব্দকে অনুসরণ করেই এবং সব দিক দিয়ে বঙ্গাব্দকে অনুসরণ করেই প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন গড়িয়া পূজা পয়লা বৈশাখ থেকে, খার্চি পূজা পয়লা বৈশাখ থেকে, পৌষ পার্বণ তথা ডম্বুরে পুণ্য স্নানাদি এবং মাসের নাম, বারের নাম ইত্যাদি।

অন্যদিকে কল্যাণমাণিক্য, গোবিন্দ -মাণিক্য, কৃষ্ণমাণিক্য ইত্যাদি রাজাদের তাম্রপত্রে 'ত্রিপুরাব্দ' বা 'ত্রিং' শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় না। বরং সেখানে 'সন' (আরবী শব্দ) বা 'সাল' (ফার্সী শব্দ) ব্যবহার হতে দেখা যায়।

মহারাজ বীরচন্দ্রের পূর্বে কোনও রাজাই ত্রিং বা ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। সুতরাং ত্রিপুরাব্দ কত প্রাচীন তা বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, "আকবর ৯৭১ হিজরি সনকে সৌর বৎসরে পরিবর্তন করে 'ফসলি সনের' সূচনা করেছিলেন।" সুতরাং ত্রিপুরাব্দ এবং বঙ্গাব্দের সূচনা ধরতে হবে ৯৭১ হিজরি সনকে ভিত্তি করেই।

পরিশেষে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, ত্রিপুরাব্দ যদি ৫৯০ খৃস্টাব্দেই সৃষ্টি হয়ে থাকত, তাহলে বলতেই হয় যে 'তিপ্রা' জনগোষ্ঠী অতি প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদিতে খুবই পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু বাস্তব তো তা বলে না। অন্যদিকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গের বিখ্যাত রাজা গোপীচন্দ্র, সমাচার দেব ইত্যাদি শক্তিশালী রাজাদেরকে পরাস্ত করে জুঝারু ফা কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল্পনিক কাহিনী মানতে হলে, তাও মানতে হয় যে প্রাচীনকালে 'ফা' রাজারা সৈন্যবল, যুদ্ধবিদ্যা বা রণকৌশলে খুব উন্নত ছিলেন। বাস্তব কিন্তু তা সাক্ষ্য দেয় না।

কারণ তখন তো বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যটাই ছিল সমতটের অধীনে এবং পরবর্তী সময়ে হরিকেল রাজ্যের অধীনে। বক্সনগর সভ্যতা এবং পিলাক সভ্যতা এর প্রকৃষ্ট এবং জ্বলন্ত উদাহরণ।

—দৈনিক সংবাদ-এর সৌজন্যে।

চিঠিপত্র

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস, বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন এবং একটি দুর্ভাবনা

গত ১ মার্চ হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। উদ্যোক্তা ছিল সর্বভারতীয় বিজ্ঞান আন্দোলন 'সংগঠক বিজ্ঞান ভারতী'র পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন'।

কিন্তু বিপুল অর্থ ব্যয় করে যে ভাবে অনুষ্ঠানটি হলো তা মিশনের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সফল হবে তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। বিজ্ঞান ভারতীর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রকৃত অবদান যা আন্তর্জাতিক অনীহা এবং মেকলে-দর্শন চালিত ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা- নিয়ামকদের ঔদাসীন্যের কুয়াশায় ঢাকা থেকে যাচ্ছে, তাকে সামনে আনা যাতে করে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-শিক্ষক গবেষকরা ভারতকে অতীত গৌরবময় স্তরে উন্নীত করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুষ্ঠান পরিচালনায় কর্মকর্তাদের এই মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। বক্তা নির্বাচনে যে সাবধানতা এবং উদ্দেশ্যমুখীনতার প্রয়োজন ছিল তার প্রতি উদাসীন্য প্রকটিত হয়েছে। 'Life and Works of Acharya P. C. Ray' নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত ডঃ শ্যামলবাবুর উপস্থাপিত বক্তব্যই তার প্রমাণ। তাঁর বক্তব্যের প্রথমাংশ ছিল কী ভাবে তিনি 'বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে' প্রথমস্থানাধিকারী নির্বাচন করেন। দ্বিতীয়াংশ ছিল এই কালাংশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর বিশিষ্ট যাদের জন্মশতবার্ষিকী হচ্ছে তাদের কথা (আয়োজিত আলোচনাচক্রে যার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই) এবং শেষাংশ ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কীভাবে তাঁর অত্যাচারী প্রজাসাধক পূর্বপুরুষ জমিদারদের পদবী রায়চৌধুরী থেকে জমিদার-জ্ঞাপক চৌধুরী অংশ (??) কেটে দিয়ে রায় অংশটি রাখেন! এবং প্রফুল্লচন্দ্র নিজস্ব সামান্য টাকা দিয়ে একটি কোম্পানি করেন যা পরবর্তীকালে কোটি টাকা অর্জন করেছিল। এবং এই বক্তব্য তুলে ধরার জন্য, যখন জনৈক অধ্যাপক বক্তার বক্তব্য চলছিল তাঁকে কয়েক মিনিটের মধ্যে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত বিসদৃশ ও অসৌজন্যমূলকভাবে। বলা হয়েছিল তিনি পরে তাঁর বক্তৃতার বাকী অংশ বলবেন। কিন্তু শ্যামলবাবুর বক্তব্যের পরই হঠাৎ বিজ্ঞান মিশনের সভাপতি ঘোষণা করে দিলেন অনির্ধারিত আর এক বক্তার নাম। প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা, মিশনের উদ্দেশ্য পূরণে কতটা সহায়ক হবে? বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের অতীত অনুষ্ঠান গুলিতেও বক্তা নির্বাচন ও পরিচালনা পদ্ধতিতে মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিহীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কতজন এসেছিল, তাদের খাবার/টিফিনে কত খরচ হয়েছে প্রামাণিক ফটোর সংখ্যা প্রদর্শন—এই সব আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন থাকলেও তা মুখ্য হ'তে পারে না। অথচ এইসব আনুষ্ঠাকিতা, সামন্ততান্ত্রিকতা বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের মূল উদ্দেশ্যকে 'হাইজ্যাক' করছে---এ সম্বন্ধে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার—কর্মপদ্ধতির সদর্থক বিন্যাস দরকার।

যে মূল সংস্থার বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের এক অঙ্গ হিসেবে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন কাজ করছে সেই সংস্থাটিও অলক্ষ্যে এই আনুষ্ঠানিকতা ও সামন্ততান্ত্রিকতার শিকার হয়ে পড়ছে কিনা তাও দেখা দরকার। কারণ অন্তরে অন্তরে এখনও দেশবাসী ওই সংস্থাটির উপর আস্থা লালন পালন করে চলেছে—তাদের মধ্যে যেন হতাশা সৃষ্টি না করে। সতর্ক থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে কোনও মিশনকে সার্থকতায় নিয়ে যেতে হলে পরিষ্কার ধোঁয়াশামুক্ত 'ভিশন' চাই-ই চাই। দায়সারা ভাবে এ কাজ চলতে পারে না।

—জনৈক অংশগ্রহণকারী।

দুর্নীতি

দেশ যখন মূল্যবৃদ্ধির আগুনে জ্বলছিল তখনই আমাদের টেলিফোন দপ্তরের সহায়তায় বিভিন্ন সংস্থাগুলি আর্থিক টকটাইম অফার দিয়ে দেশবাসী ও যুবসমাজের দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছিল। টু-জি কেলেঙ্কারী প্রকাশ হওয়ার পর এটা স্পষ্ট যে অনৈতিক ভাবে সংস্থাগুলিকে স্পেকট্রাম পাইয়ে দেওয়া তিন জন অর্থনীতিবিদ রাজনীতিক রয়েছেন। সেখানে একা রাজা তার মস্তকপ্রসূত বুদ্ধি দিয়ে দেশবাসী মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে বিমুখ রাখবেন এটা অকল্পনীয়। সুতরাং এই কেলেঙ্কারীর পিছনে অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী যে জড়িত আছেন তা সহজবোধ্য। কিন্তু সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সকলেই রাজাকে দোষ দিতে আসরে নেমেছেন। কিন্তু নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তাঁরা একটি বারও জে পি সি গঠনকে স্বাগত জানাচ্ছেন না। মিথ্যা অভিযোগে যখন বিভিন্ন সাধু-সন্তদের গৈরিক-সন্ত্রাসের নামে পাকড়াও করা হচ্ছে, তাদের নারকো টেস্ট পর্যন্ত করা হচ্ছে, সেখানে যে মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশের মানুষ আত্মহত্যাও করেছেন তাকে চাপা দেওয়ার অপরাধে জে পি সি তদন্তও হওয়া উচিত নয় কি? এই কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যত্র রেখে অসাধারণ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে গভীর সঙ্কটে। কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়তো ১০০-১৫০ মানুষকে সঙ্কটে ফেলে, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার এই ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে ভারতবাসীকে সঙ্কটে ফেলেছেন। এটা সন্ত্রাসবাদের চেয়ে কম কিসে? এ ব্যাপারে যুবরাজ কিন্তু নিশ্চুপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী টু-জি কেলেঙ্কারী ভারতের বৃহত্তম কেলেঙ্কারী কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মতে ক্যাগের রিপোর্টটি ভুল। এখানে প্রশ্ন জনগণের টাকায় চলা এই সমস্ত সংস্থা যদি ভুল রিপোর্টই দেবে তাহলে সেগুলি রাখার দরকার কি? কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকেই তো এই দায়িত্ব দিলে হয়।

—রাজু হালদার, হালাড়া, জামালপুর, বর্ধমান।

আরব দুনিয়ায় গণঅভ্যুত্থান

আরব দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে শাসকবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে আগুন জ্বলছে, সরকারি নির্দেশে অভ্যুত্থান বা আন্দোলন দমনকারী সেনা-পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে, আবার আক্রান্ত সেনা-পুলিশ আক্রমণ করছে আন্দোলনকারীদের। চলছে গুলি, মরছে মানুষ, কোথাওবা উভয়পক্ষের মধ্যে চলছে গোলাগুলিও—এমন কী, বিমান থেকে সেনারা গোলা ও বোমা বর্ষণও করছে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে। তবে মিশর ও লিবিয়ায় সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। ফলে ওই দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশছেড়ে পালিয়েছেন বা পালাচ্ছেন অন্যান্য রাষ্ট্রেও গণ-আন্দোলন চরম আকার নিচ্ছে।

আমরা জানি, মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই ইসলামিক, রাজতান্ত্রিক ও সামরিক শাসনতান্ত্রিক তথা একনায়কতান্ত্রিক। মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান হোসনি মুবারক ও লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মুয়াম্মার গাদ্দাফি উভয়ই ফৌজি। তাঁরাও তাঁদের পূর্ববর্তী সামরিক শাসকদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। ইসলামে এটাই দস্তুর। ক্ষমতার লোভে আল্লার বান্দারা পারে না এমন কোনও কাজই নেই। প্রয়োজনে পিতা, ভ্রাতা বা নিকটাত্মীয়কে খুন করতেও হাত-পা কাঁপে না তাদের। আরব দুনিয়ায় এর প্রমাণ আছে অসংখ্য। ভারতেও আছে, তাদের প্রায় আটশ বছরের শাসনে। উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে 'জিন্দাপীর' আওরঙজেবের সিংহাসন দখল। আওরঙজেব তাঁর তিন ভ্রাতাকে হত্যা এবং পিতাকে বন্দি করে দখল করিছেলেন সিংহাসন। স্বৈরাচারী একনায়ক মুবারক ও গাদ্দাফি দশকের পর দশক দেশ শাসন করেছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে। তাঁরা বন্দুকে উঁচিয়ে দেশশাসন করেছেন, জনগণকে শোষণও করেছেন। দুর্নীতি ও 'হরিরলুট'-এর টাকায় গড়েছেন সম্পত্তির পাহাড়। অর্থ ও সম্পদে তাঁরা লক্ষ কোটি ডলারের মালিক। বিদেশের বহু ব্যাঙ্কে তাঁদের কালো টাকা উপচে পড়ছে। বহুদেশে রয়েছে তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ি, জমি ও সহায়সম্পদ। অন্যান্য রাজতান্ত্রিক, ইসলামিক ও সামরিক একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাই ওইসব রাষ্ট্রেও শুরু হয়েছে গণআন্দোলন। সরকারবিরোধী সেই গণ-আন্দোলন গণ-বিস্ফোরণে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়। তবে যে গুটিকতক মুসলিম রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রচলিত সেইসব রাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের আড়ালে চলছে স্বৈরতন্ত্র ও শরিয়ত তন্ত্র। ওইসব রাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাকর্তারাও দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার ও দেশ-বিদেশে বহু মূল্যের সম্পত্তির মালিক। এক্ষেত্রে উদাহরণ পাকিস্তান। নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও ৬৪ বছরের স্বাধীন পাকিস্তানের অর্ধেকটা বছর কেটেছে সামরিক শাসনে। দু'জন প্রধানমন্ত্রী (লিয়াকত আলি ও বেনজির ভুট্টো) উগ্র ইসলামিক জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছেন। আর এক প্রধানমন্ত্রী (জুলফিকার আলি ভুট্টো)-কে ফাঁসি দিয়েছেন 'ক্যু'-এর মাধ্যমে ক্ষমতাদখলকারী সেনা প্রধান তথা স্বঘোষিত রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক। যিনি আবার নিহত হয়েছেন বিমান দুর্ঘটনায়। পাকিস্তানে এখন চলছে সরকারি শাসনের সমান্তরাল তালিবানি শাসন। শরিয়াত আইন চালুর উদ্দেশ্যে তালিবান জঙ্গিরা পাক পাঞ্জাবের গভর্নর ও সংখ্যালঘু মন্ত্রীকে হত্যা করেছে। প্রায় প্রতিদিন ঘটাচ্ছে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ তারা। তাছাড়া মসজিদে ঢুকে নামাজীদের করছে তারা হত্যা। বিস্ফোরণে মসজিদ দিচ্ছে উড়িয়ে। এমতাবস্থায় আরব জুড়ে যে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে তা তালিবান ও আল কায়দার মদতে শরিয়তি আইন চালুর পক্ষে, না গণতন্ত্রের দাবিতে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

সংখ্যালঘু 'হিন্দু'

পত্রপত্রিকা এবং নেতা নেতৃদের মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায় যে ভারতবর্ষ প্রায় ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৫ শতাংশ মুসলমানের বসবাস। তাহলে বাকি প্রায় ৬৫ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশ ভারতীয় হলো হিন্দু। আমার প্রশ্ন হলো এরা এটা কি করে বলতে পারেন যে, মুসলিম সম্প্রদায় এবং খৃস্টানদের বাদ দিলেই বাকি সবই হিন্দু? যারা এটা বলেন, তারা কি তবে এই মানুষ গুলোকে কোনদিনও জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি হিন্দু? না এরা তো কোনও দিনও এটা কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি। এই বাকি প্রায় ৪০ শতাংশ ভারতীয়কে যাদের এরা ধরেনিয়েছেন যে হিন্দু এই হিসাবটা একেবারেই ভুল, প্রায় ২০ শতাংশ ভারতীয় যে মুসলমান এটা একেবারেই ঠিক কারণ এই মুসলমান সম্প্রদায় একেবারেই আবালবৃদ্ধবনিতা—সবাই মনেপ্রাণে মুসলমান। এমন কোনও মুসলমান নেই যে তাদের কোরাণ নির্দেশিত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন না। যেমন মসজিদে যায় না এমন মুসলমান ভারতে কেন সারা পৃথিবীতেও একটি খুঁজে পাবেন না। নামাজ পড়েনি বা পড়ে না এমন মুসলমান খুঁজে পাবেন না। পুত্র সন্তানের লিঙ্গের একটা অংশ ছেদন করে মুসলমানি করেনি এমন কোন মুসলমান পৃথিবীতে নেই। শুধু তাই নয়(সারা পৃথিবী জুড়ে জেহাদের নামে মুসলিম বিশ্ব গড়ার যে কাজ চলছে তাতেও এরা সারা পৃথিবীর মুসলমান এক মত।

সারা পৃথিবী জুড়ে কোথাও কোনও দিন এই জেহাদের নামে মানুষ খুনের যে খেলা চলছে তার বি(দ্ধে কোনও মুসলিম সংগঠনের প(থেকে কোনও প্রতিবাদের একটা কথাও শুনতে পারেন না কারণ এটাই ইসলাম তথা মুসলমানের ধর্ম। অমুসলিম এবং অ-খৃস্টান ভারতীয়কে যদি হিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায় তবে হিন্দু কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে না, এবং তাহলেই হিসাবটা মেলানো যেতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, বাকিটা হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় তা হলে হিসাবটা কোনও মতে মেলেনা। কারণ এই বাকি ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ ভারতীয়র মধ্যে কেউ বলে আমরা ধর্ম মানিনা। আমরা মার্ক্সবাদী। আবার কেউ বলে আমি হিন্দু নই(আমি মুসলিম নই, আমি খৃস্টানও নই আমি একজন মানুষ, আমি গান্ধীবাদী। আবার কেউ বলে আমি ধর্মনিরপে(যার কোনও অর্থই নেই। একজন তথাকথিত হিন্দুশি(ক বলেন, আমি একজন শি(ক, আমার ধর্ম শি(াদান। আমি ভাই হিন্দু-টিন্দু বুঝি না। একজন তথাকথিত হিন্দু সরকারী অফিসার বলেন, সরকার আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। একজন তথাকথিত হিন্দু ডাক্ত(ার উকিল প্রায় সকলেরই একই কথা। একজন তথাকথিত হিন্দু ব্যবসায়ীও একই কথা বলেন যে, আমার কাছে কথা সব ক্রে(তাই সমান সুতরাং আমাকে কি হিন্দু হিন্দু করলে চলবে। একজন তথাকথিত হিন্দু গরিব সে বলে আমি খাটি খাই। সুতরাং আমার কাছে আবার ধর্ম কি? হিন্দু কি? মুসলমান কি? আমার কাছে সব ধর্মই সমান। অথচ উপরি উল্লিখিত হিন্দুদের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাহলে ভারতবর্ষ তিন টুকরো হলো কেন? যার দুটো টুকরো পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। আজকে ধর্ম নিরপে(ভারতে মুসলমানদের জন্য আলাদা আইন (শরিয়তি) কেন? হিন্দু মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ বছর আর মুসলমান মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৪ বছর কেন? মাদ্রাসা শি(া ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বীকৃত শি(া প্রতিষ্ঠান কেন? মুসলমানদের জন্য ধর্মনিরপে(ভারতে আলাদা করে সংর(ণ কেন? কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

ভারতবর্ষের মানুষ কেউ বুদ্ধদেবের আদর্শে বিশ্বাসী, কেউ গুনানকের, কেউ চৈতন্যর, আবার কেউ মহাবীরের। কেউ কৃষ্ণে(র, কেউ রামের, কেউ কালিভক্ত(, কেউ রাধা ভজনা করে। এখানে কেউ মূর্তিপূজা করে। কেউ গাছকে, কেউ সূর্যদেবকে আবার কেউ নদীকে আরাধনা করে। কেউ গ(কে, আবার কেউ বাঘকে পূজা (বনবিবি) করে। সুতরাং এখানে হিন্দুর কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সুতরাং ভারতবর্ষে হিন্দু বলতে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বোঝায় না। এখানে হিন্দু বলতে অমুসলিম ও অ-খৃস্টান ভারতীয়কে বোঝায়। প্রকৃতপ(ে আমরা যাদের হিন্দু বলি এরা বড়ই বিচিত্র ও অদ্ভুত। হাজার বছরের ও অধিক বছর ধরে শক হুন, মোগল পাঠান তুর্কী ইংরেজ যে যার মত ইচ্ছা, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ, করেছে, এই তথাকথিত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। তথাপি এদের কোনও চেতনা নেই যে, আগামি দিনে শুধুমাত্র হিন্দু হবার জন্যই আমাকে আবার অত্যাচারের শিকার হতে হবে। সুতরাং হিন্দু শব্দটাকে আপন করে আগলে ধরে হিন্দুত্বের আহ্বানে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এটুকুও এরা অনুভব করতে চায় না। ভারতবর্ষে তাই মুসলমানরা মুসলিম পাকিস্তান ও মুসলিম বাংলাদেশের দাবি করতে পারে। হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রের কথা এখানে বলা চলবে না। কেউ যদি হিন্দুর কথা বলে তবে সে হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক, অপরপ(ে মুসলমান বলেই প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রত্য(এবং পরো(সমর্থন আছে লাদেন, আফজল বা কাসাবের মতো জেহাদিদের প(ে আর কোনও মুসলমান যদি তা না করে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই মুসলমান-ই ননে। তার হাল হবে তসলিমা বা (শদির মতো। যে দুচার পাতা কুরান-শারিফ পড়েছে সেও জানে সে, পৃথিবীটাতে একমাত্র আল্লাহ্-রই অধিকার আছে, অন্য কারোর নয়। তাই আল্লাহারই নির্দেশ আছে অবিশ্বাসীদের অর্থাৎ অমুসলমানদের শেষ করে দাও।

কিন্তু একজন কৃষ্ণভক্ত(কখনওই বলে না যে কালী ভক্ত(দের শেষ করে দাও। একজন জৈন কখনও বলে না যে বুদ্ধ অনুগামীদের শেষ করে দাও। শিখ বলে না রাম ভক্ত(কে শেষ করে দাও।

যে অল্প-সংখ্যক মানুষ বুঝেছে যে, ইসলামের হাত থেকে অমুসলমানদের নিস্তার নেই। আর শুধুমাত্র এই একটা কারণেই তারাই অল্পসংখ্যক হিন্দু পরিচয় দিয়ে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে চাইছে। আর ভারতের বুকে এই হিন্দুর সংখ্যা খুব নগণ্য এবং প্রকৃত অর্থে হিন্দুরাই ভারতে সংখ্যালঘু।

—বিজয় চন্দ্র দে, ডায়মন্ডহারবার।

চিঠিপত্র বিষয়ে

স্বস্তিকা'র চিঠি-পত্র বিভাগের পক্ষ থেকে পত্র-লেখকদের কাছে অনুরোধ—পত্র ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে দু'পাশে মার্জিন রেখে লিখবেন। পরিস্কার স্পষ্ট হস্তাক্ষরে মূল কপি পাঠাবেন। জেরক্সকপি ছাপার জন্য বিবেচিত হয় না। অমনোনীত পত্র বা লেখা যাইহোক না কেন, তা ফেরৎ দেওয়া হয় না। দুটো লাইনের মধ্যে ফাঁক থাকা বাঞ্ছনীয়। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে মতামত প্রকাশ করলে ভালো হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিষয়ে যত দ্রুত মতামত আসে ততই ভালো।

চিঠি-পত্র বিভাগ, স্বস্তিকা

পরম্পরা

চলো যাই গাজন তলায়

নির্মল কর

বঙ্গসংস্কৃতির ধর্মীয় উৎসব 'গাজন'-এ উনবিংশ শতকের বাবুসমাজ শিবালয় প্রতিষ্ঠা করে সঙের নাচ দেখতেন আর চড়কগাছ পুঁতে সন্ন্যাসী ঘুরিয়ে মজা পেতেন। তারপর গাজনতলা থেকে সোজা বাগানবাড়ি। সেখানে বাঈনাচ, গানের হররা ও ইয়ারবক্সীদের মেলা। পরদিন ভোরে কেল্লার তোপধ্বনিতে জেগে উঠে চোখ কচ্‌লে দেখতেন এ আর একদিন, নতুন দিন, নতুন বছর।

বাংলার রম্য-বসন্ত যখন তপ্ত চৈত্র শেষে গলদঘর্ম, তখন অনিবার্যভাবে এসে পড়ে আমাদের প্রাচীন লোক উৎসব গাজন। কারণ চৈত্রমাস শিবের মাস, রুদ্রের মাস। একবিংশ শতকের নগরায়ণের দাপটে এরাজ্যের কত রং বদলেছে ছন্দে ছন্দে। গাঁ-গঞ্জের আর শহরের সেই অতীত আর নেই। থাকলে আজকের নবাঙ্গিক চৈত্রের বঙ্গসংস্কৃতি নিয়ে নব্য হুতোম তাঁর নতুন নক্‌শা লিখতে বসতেন— যেমনটি লিখেছিলেন উনিশ শতকের সমাজচিত্রী হুতোম।

লোকবিশ্বাস যে, চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিবের বিয়ে হয়েছিল নীলচন্ডিকা বা নীলপরমেশ্বরীর সঙ্গে। বিয়ের বরযাত্রী হয়েছিলেন শিবানুগত সন্ন্যাসীরা। সেদিন শিবের নামে সন্ন্যাসীদের আনন্দোল্লাস আর ঢাকঢোলের মহানন্দ যে-গর্জনের সৃষ্টি করে, তা থেকেই গাজন শব্দটি উৎপত্তি। অন্য একমতে গ্রামের 'গাঁ' ও 'জন' অর্থাৎ জনসাধারণকে নিয়ে অনুষ্ঠিত বলে উৎসবটির নাম হয়েছে গাজন।

গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করার রীতি আছে। যাঁরা শিবের কাছে মানত করেন, তাঁরাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নারী পুরুষ যে-কেউ সন্যাস নিতে পারেন। সারা চৈত্রমাস ধরে কঠোর নিয়মে সন্ন্যাস পালন করতে হয়। দিনের বেলায় উপোসী থেকে রাত্রে ফলাহার বিধেয়। এই ব্রতধারীদের বলা হয় গাজনের সন্ন্যাসী সাজতেন দুলে, বেয়াড়া, ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেনে, হাঁড়ি, কাঁসারিরা। এঁদের সর্বাঙ্গ জুড়ে থাকত গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, পরণে সেপাইপেড়ে মালকোচা ঢাকাই শাড়ি, হাতে তারকেশ্বরের ছোপানো গামঝা আর গলায় বেলপাতা- বাঁধা সাদা সুতোর উত্তরীয়।

গাজনকে ঘিরে বাংলার শহরে গঞ্জে নানা রকম সঙের প্রচলন আছে। চৈত্রসংক্রান্তির ক'দিন আগে থেকে ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মেখে টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায়

শিল্পীর তুলিতে সেকালের কলকাতার চড়ক-পুজো।

হরগৌরীর সঙ সেজে, কেউ কেউ নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত- পিশাচের সঙে রঙ-তামাশা করতে করতে দশলকি ফুঁড়ে চৈত্রের খর-রৌদ্রে নাচতে নাচতে পথ-পরিক্রমা করেন। মাটির সরা ও ত্রিশূল হাতে কেউ কেউ গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি বোলান গেয়ে মাধুকরী সংগ্রহ করেন। মহাবিষুব সংক্রান্তির সায়াহ্নকাল পর্যন্ত ব্রতধারীরা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গাজনের ছড়া কাটেন, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব!' এঁদের কারও হাতে লম্বা ছিপ, যার মাথায় শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেই সঙ্গে ঢাকের শব্দে বোল ওঠে, 'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং, চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।' একদল সন্ন্যাসী বুকে পিঠে বাণ ফুটিয়ে কালীঘাট থেকে শিবের গান গাইতে গাইতে গাজনতলায় সমবেত হয়ে ঢোলের সঙ্গতে ভজন গাইতে থাকেন, 'ব্যোম্ ভোলা ব্যোম্ ভোলা/ভোলা বড় রঙ্গিলা/লেংটা ত্রিপুরারি, শিরে জটাধারী/ভোলার গলে দোলে/ হাড়ের মালা।'

মানতকারী সন্ন্যাসীরা শিবঠাকুরের কৃপালাভের আশায় কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, বাণফোঁড় ও ঝুল-সন্ন্যাসের মতো কতকগুলো ভয়ঙ্কর ধর্মীয় আচার পালন করেন। অনেক উপর থেকে বৈঁচিফুলের কাঁটার ওপর এবং বাঁশের উঁচু মাচা থেকে তাঁরা মহাদেবের নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঝুল-সন্ন্যাস হলো খোলা মাঠে ভাড়ার বাঁশে দু'পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুন আর ধুনোর ধোঁয়ার মধ্যে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে মানতকারীদের দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করা।

এককালে সুতানুটিতে দোল দুর্গোৎসবের মতো চড়কেও বাবুবিলাসের রমরমা ছিল। গাজনতলা চৈত্রসংক্রান্তির দিন শিবের বরলাভের আশায় বঁড়শিবিদ্ধ সন্ন্যাসীরা চড়কদণ্ড থেকে শূন্যে চক্রাকারে পাক খেতেন। হুতোম এই চড়কের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, ''শহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ি, ফেটিং ও স্টেট্ ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন, কেউ কাঁসারীদের সঙয়ের মতো পালকি গাড়ীর হাতের উপর বসে চলেছেন— ছোটলোক বড়মানুষ ও হঠাৎবাবুরাই অধিক।... একজন চড়কি পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে, মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশপানে চড়কির পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কি প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, কখন পা নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল দে পাক দেপাক শব্দ। কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরানো হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেকচেন।''

চড়কগাছে ঘুরতে ঘুরতে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে প্রায় প্রতি বছরই দুর্ঘটনা ঘটত অথবা মৃত্যু হোত চড়কিদের। ১৮৬৫ সালে তৎকালীন লাটসাহেব স্যার সিসিল বিডন আইন করে এই বীভৎস ধর্মীয় প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে গাজনের সন্ন্যাসীদের আত্মনিগ্রহ কিছুটা কমেছে বটে, তবে ঝাঁপ ফোঁড়ের মতো আচার অনুষ্ঠান সমারোহেই চলছে। কেননা, শিবের নামে কৃচ্ছ্রসাধনা এবং শারীরিক নির্যাতন এই অনুষ্ঠানের মূল কথা।

সেকালের শিক্ষিত ও সম্পন্ন বাবু সমাজ নানাস্থানে শিবালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বছর এইসব গাজনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, সঙের নাচন দেখতেন আর চড়কগাছ পুঁতে, সন্ন্যাসী ঘুরিয়ে মজা পেতেন। কলকাতা হয়ে উঠত সঙের শহর। পথের ধারে দাঁড়িয়ে লোকে সঙের মিছিল দেখত। কালীঘাট থেকে ব্রতী-সন্ন্যাসীরা শরীরে বাণ বিঁধিয়ে ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে যখন শোভাযাত্রা করে আসতেন, পথের ধুলোয় কালীঘাট থেকে কলুটোলা হয়ে উঠত ধুলিধূসর। আরও নানাস্থানের সঙ শহর উত্তাল করে তুলত। সবচেয়ে প্রাচীন ও বৈশিষ্টপূর্ণ সঙ ছিল জেলেপাড়ার সঙ। এই বর্ণাঢ্য সঙ চৈত্রের শেষ দিনটিকে সরগম করে তুলত। গাজনের সঙ যা প্রকাশ করত, তার প্রধান বিষয় ছিল ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ। সমাজের তাবৎ অন্যায় ও দুর্নীতি এসব সঙে-গাথা ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হোত।

আর গাজনকে ঘিরে দিকে দিকে জমাটি মেলা বসে যেত। ছাতুবাবু লাটুবাবুদের চড়কতলায় 'টিনের ঘুরঘুরি', টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা-বাঁশের বাঁশি, হলদে, রংকরা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেছে (হুতোম)। গাজনের পৃষ্ঠপোষক সেইসব বাবুরা মেলায় যেতেন 'পায়নাপোলের চাপকান' গায়ে, 'রুমালে সুগন্ধি বোকো' মেখে, সৌখিন দামী চীনা জুতো পরে। গাজনতলা থেকে সোজা বাগানবাড়ি। সেখানে সারারাত বাঈনাচ, গানের হররা আর ইয়ারবক্সীদের মেলা বস্‌ত। পরের দিন ভোরে কোম্পানির কেল্লার তোপধ্বনিতে বাবুরা জেগে উঠে চোখ কচ্‌লে দেখতেন— এ আর একদিন, নতুন দিন, নতুন বছর। আজ বাবুদের গাজনের সেই বোলবোলা নেই। হুতোমের যুগের ধোপদুরস্ত বাবুরা বড় বড় জুড়ি ফেটিং চেপে চড়কও দেখতে আসেন না। গাজন সন্ন্যাসীদের আত্মনিগ্রহের ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়ে এলেও তারকেশ্বর, বাঁকুড়ার একতেশ্বর, মুর্শিদাবাদের উদ্ধারণপুর, বর্ধমানের কুড়মুন, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বালসিদ্ধি আর বাংলা ও ওড়িশা সীমান্তে চন্দনেশ্বরের গাজনে এবং সুতানুটির ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের ঘূর্ণি আর মেলার চমক আজও, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানুষকে আহ্বান জানায়, 'চলো যাই গাজনতলায়'।

কর্মযোগ

রেলে স্পেশ্যাল ক্লাস অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নীল উপাধ্যায়।। ভারতীয় রেলের মেকানিক্যাল শাখায় ৪২টি আসনে স্পেশাল-ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নম্বর 07/ 2011-SCRA dated 26-3-2011. পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অঙ্ক ও ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

বয়স ঃ ১ আগস্ট, ২০১১ তারিখে ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি রা ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

আবেদনের পদ্ধতি ঃ দরখাস্ত করা যাবে অফলাইনে ও অনলাইনে। ইউ পি এস সি-র ওয়েবসাইট www. upsconline.nic.in মারফত অনলাইনে আবেদন করা যাবে ২৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখ পর্যন্ত। অফলাইনে আবেদন করা যাবে নতুন কমন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম (Form E) অনুযায়ী। ফর্ম কিনতে পাওয়া যাবে বড় পোস্ট অফিস থেকে ৩০ টাকার বিনিময়ে।

পরীক্ষার ফি ঃ অনলাইন আবেদন ফি ৫০ টাকা। এই ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায়। ফি জমা দেওয়া যাবে নগদে বা মাস্টার কার্ড, ভিসা বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ফি বাবদ ১০০ টাকার একটি সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প দিতে হবে। এই স্ট্যাম্পও পাওয়া যাবে বড় পোস্ট অফিসগুলিতে। স্ট্যাম্পটি দরখাস্তের নির্ধারিত স্থানে সেঁটে কাউন্টার ক্লার্ককে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন। তপশিলী, মহিলা ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের এই ফি লাগবে না।

(এরপর ১৩ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ৩১

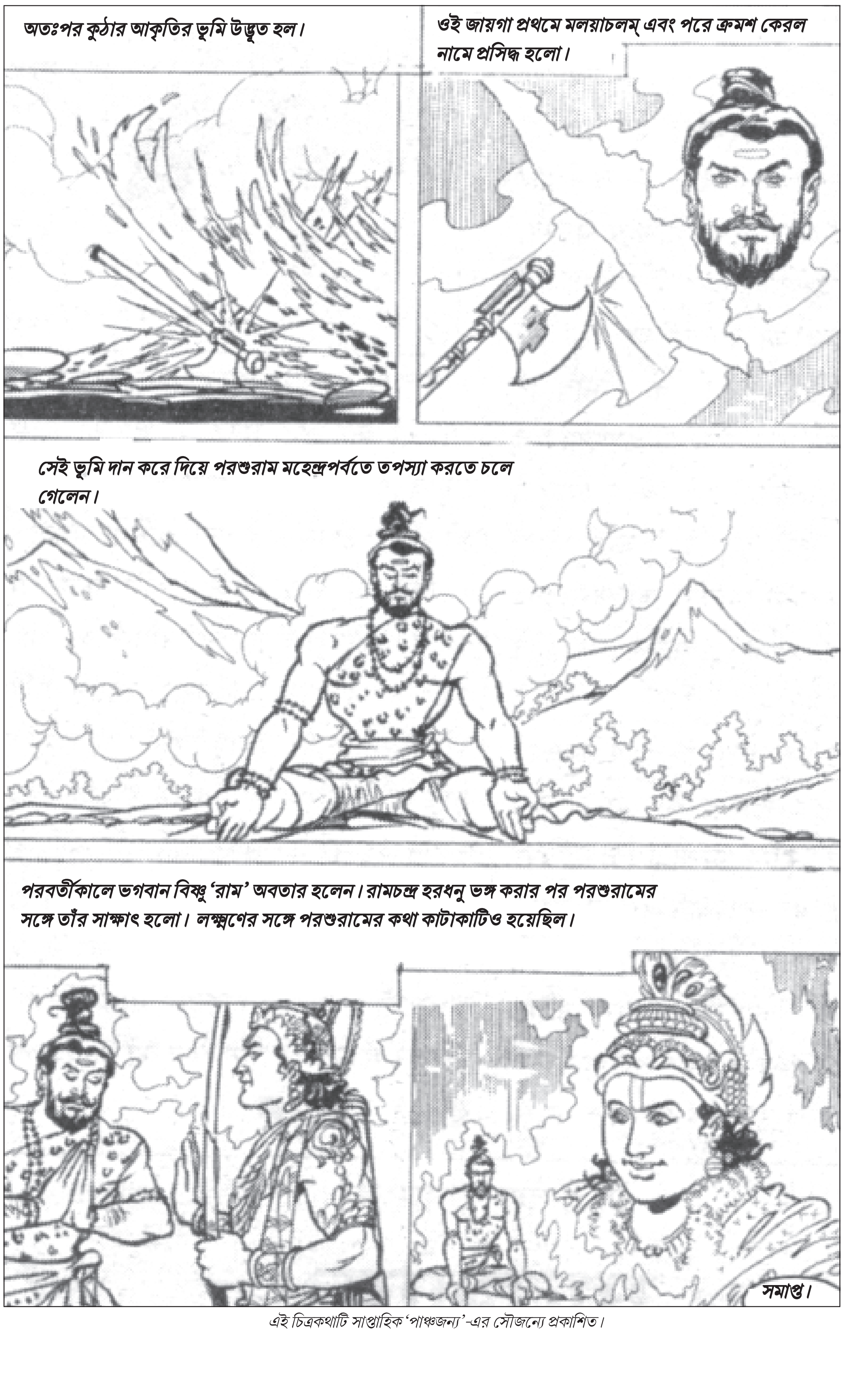

এই চিত্রকথাটি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।

নির্মল কর

হৃদরোগ সারাবে রোবট

মাত্র ২০ মিলিমিটারের একটি রোবট আগামী দিনে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে। রোগীর বুকে সুচের মতো ফুটো করে 'হার্টল্যান্ডার' নামে ওই রোবটকে ঢুকিয়ে দিলেই হৃৎপিণ্ডের চারদিকে প্রতি মিনিটে সে ১৮ সেন্টিমিটার হেঁটে বেড়াতে সক্ষম। এমন কী যেখানে ছুরি কাঁচি পৌঁছনো সম্ভব নয়, সেখানেও সে কাজ করে যাবে। পেনসিলভানিয়ার পিট্সবার্গের কার্নেজি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্যামেরন রিভিরি এটি তৈরি করেছেন। রোবটের পায়ে ভিডিও ক্যামেরা থাকে, যাতে প্রতি মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরের ছবি ফুটে উঠবে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু র‍্যানকিনের মতে, বুকের যে-কোনও শল্য চিকিৎসায় এই রোবট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

হাসিই মোক্ষম দাওয়াই

হাসিই যে অনেক রোগের ওষুধ সেটা এখন নেহাৎ কথার কথা নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, সামান্য একটু মুচকি হাসিতেও হৃৎপিন্ডে বেশ কিছুটা রক্ত সঞ্চালিত হয়। পায়ের আলসারের মতো কঠিন রোগেও ওইটুকু রক্তসঞ্চালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলসারের বেশ কজন রোগীর ওপর গবেষণা চালিয়ে লিড্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, একটু হাসিতেই অনেকটা রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে এদের শরীরে। এর ফলে হার্টের ডায়াফ্রম উদ্দীপিত হচ্ছে অনেকটা। এছাড়া মুটিয়ে যাওয়া আটকাতে, শরীরের অসাড়তা দূর করতে ওষুধ হিসেবে হাসির কোনও তুলনা নেই।

স্পেনীয় বিজ্ঞানীরা এবার মানুষের মূত্রনালীতে ক্যানসারের কারণ খুজে পেয়েছেন। জলের মধ্যে বেশিক্ষণ সাঁতার কাটা, বা ক্লোরিনযুক্ত জলে বারবার স্নান করলে এধরনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা। 'ট্রাইহ্যালোমিথেন' নামের রাসায়নিক পদার্থটি ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। পদার্থটি ক্লোরিনযুক্ত জলে তৈরি হয় এবং মানুষের ত্বকে এটিকে খুব সহজে শোষণ করে নেয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্লোরিনযুক্ত জল খেলেও ক্যান্সারের ক্ষতিকর বীজ প্রবেশ করে শরীরে। অত্যধিক সাঁতারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের দেহে ব্লাডার ক্যান্সারের সম্ভাবনাই বেশি।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রঙ্গকৌতুক

যাত্রী ঃ স্টেশন মাস্টার, ট্রেন যখন সময় মতো চালাতে পারেন না, তখন টাইম-টেব্‌ল বিক্রি করেন কোন্ মুখে?

স্টেশন মাস্টার ঃ ওটা আছে বলেই তো জানতে পারছেন কোন্ ট্রেন কত লেট!

* * *

নাসিরুদ্দিনের বন্ধু ঃ তুমি নাকি সব কিছু দু'টো করে দেখছ? এক ছেলের জায়গায় দু'টো ছেলে? একটা ফাউ নাকি?

নাসিরুদ্দিন ঃ ঠিকই শুনেছ, এই যেমন তোমার দু'পায়ের জায়গায় চার পা দেখছি— ঠিক আমার গাধাটার মতো!

* * *

নিয়োগকর্তা ঃ এ সপ্তাহে কাজের জন্য রোজ পঁচিশ টাকা করে পাবে। পরের সপ্তাহ থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজ।

কর্মপ্রার্থী ঃ ঠিক আছে স্যর, আমি তাহলে পরের সপ্তাহ থেকেই কাজ করবো।

* * *

শিক্ষক ঃ ছাতার ইংরেজি কি বল্।

ছাত্র ঃ আমব্রেলা।

শিক্ষক ঃ আর ছাতুর ইংরেজি কী হবে?

ছাত্র ঃ এ তো খুব সোজা স্যর, আমব্রেলু।

* * *

—তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের জেড প্লাস' নিরাপত্তা নিতে চাইছেন না কেন বল্‌তো?

—তিনি যে রাজ্য সরকারের এ টু জেড কিছুই পছন্দ করেন না!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। শুক্রদেবের শাপে মহাভারতের কোন্ রাজাকে অকালে জরাগ্রস্ত হতে হয়?

২। গল্পে-পড়া লম্বা নাকওয়ালা কাঠপুতুল পিনোচ্চিওর পোষা ছোট্ট কুকুরটির নাম কী?

৩। কোন্ টেস্টম্যাচ-এ তিনজন ব্যাটস্‌ম্যান ৯৯ রানে আউট হয়েছিলেন?

৪। কোন্ গ্রন্থে ফা-হিয়েন রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাওয়া যায়?

৫। ভারতের প্রথম মহিলা এয়ারমার্শাল- এর নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। যযাতি-কে

২। ফিগারো

৩। ১৯৭৩ সালে করাচি টেস্টে পাকিস্তানের মজিদ খান, মুস্তাক মহম্মদ এবং ইংল্যাণ্ডের ডেনিস অ্যামিস।

৪। ফু-কো-কি গ্রন্থে

৫। পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলে স্পেশ্যাল ক্লাস

(১২ পাতার পর)

পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৩১ জুলাই ২০১১। ৬০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে তিনটি পত্রে। প্রথম পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল এ্যাবিলিটি টেস্ট, ইংলিশ, জেনারেল নলেজ ও সাইকোলজিক্যাল বিষয়ে প্রশ্ন। কোড নম্বর ০১। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় থাকবে ফিজিক্যাল সায়েন্স (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি) বিষয়ে প্রশ্ন। কোড নং ০২। তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ম্যাথ্‌মেটিক্স বিষয়ে। কোড নং ০৩। প্রতিটি বিষয়ে ২০০ করে নম্বর। সময় ২ ঘণ্টা করে। সব বিষয়েরই প্রশ্ন করা হবে অবজেকটিভ টাইপের। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দেখা যেতে পারে www.upsc.gov.in ওয়েবসাইটে। কলকাতা ছাড়াও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে রাঁচি, পাটনা, রায়পুর ও সম্বলপুরে।

অফলাইনে আবেদন করলে পূরণ-করা আবেদন পত্রের সঙ্গে দিতে হবে ঃ (১) সম্প্রতি তোলা ৩.৫×৪.৫ সেমি. মাপের এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। ফটো সেঁটে দিতে হবে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায়, (২) দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডটি যথাযথভাবে পূরণ করে তাতে ৬ টাকার একটি ডাকটিকিট সেঁটে দিতে হিবে, (৩) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট বা ও বি সি বা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত প্রতিলিপি।

অনলাইনে দরখাস্তের ক্ষেত্রে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে রাজ্যের বিভিন্ন পোস্ট অফিস থেকে, যথা— কলকাতা (জিপিও), আলিপুর, বড়বাজার, বেলেঘাটা, বেলঘরিয়া, কাশীপুর, পার্ক স্ট্রিট, টালিগঞ্জ, বালুরঘাট, বারাসাত, বর্ধমান, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, বহরমপুর, কোচবিহার, হাওড়া, দার্জিলিং, সিউড়ি, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, মালদা ও মেদিনীপুর।

পূরণ-করা আবেদন ভরা খামের ওপর লিখতে হবে Controller of Examinations, Union Public Service Commission, Dholour House, Shahjahan Road, New Delhi-110069.

আবেদন পত্র পাঠাতে হবে স্পিডপোস্টে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১১-এর মধ্যে। প্রয়োজনে প্রার্থীরা এই ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ০১১-২৩৩৮-৫২৭১/২৩৩৮-১১২৫/২৩০৯-৮৫৪৩।

বিশ্বব্যাপী ভারতীয় প্রতিভা

(৫ পাতার পর)

প্রতিভা আমাদের, আর নাম তোমাদের?

পরন্তু এরকমও নয় যে, পশ্চিমী জগত ভারতীয় প্রতিভার বিকাশের জন্য খোলা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। স্মরণ করুন জগদীশচন্দ্র বসুকে, যিনি ১৮৯৯ সালে বেতার আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দু'বছর পরেই ১৯০১ সালে মার্কনি এই আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করে নেয়। এর ১০০ বছর পরেও এরকমই হচ্ছে। ডাঃ রঙ্গস্বামী শ্রীনিবাসনের নাম আমরা শুনেছি। তিনি মহান বৈজ্ঞানিক যিনি 'নিকট দৃষ্টি দোষ' (Byfocal) দূর করার জন্য 'লেসার' প্রযুক্তির বিকাশ করেছেন। যার ফলস্বরূপ অসংখ্য মানুষ চশমা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এই আবিষ্কার আই বি এম-এর নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পরিবর্তে ডাঃ শ্রীনিবাসন মাত্র ১০,০০০ ডলার পেয়েছেন। এ বিষয়ে যখন তাঁর সহযোগী ডাঃ প্রবীণ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এত বড় আবিষ্কার বিনাখ্যাতিতে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো? উত্তরে ডাঃ চৌধুরী বলেছিলেন, 'সত্যিকারের আনন্দ আবিষ্কারের মধ্যে আছে, তার নামের মধ্যে নেই।' ডাঃ চৌধুরীর চেয়ে এই বিষয়ে ভালোমতো ভাবনা সম্ভবত আর কেউ করতে পারতেন না। কেননা, ডাঃ প্রবীণ চৌধুরীও সেই মহান বিজ্ঞানী যিনি পুনর্লেখন করতে পারা কম্প্যুটরের সিডি (Re-writeble Compact Disk)-এর আবিষ্কারক ও ডাঃ শ্রীনিবাসনের মতো পারিশ্রমিক গ্রহণ করে আই বি এম-এর নামে পেটেন্ট করে দিয়েছেন।

রকেট কারিগরী ক্ষেত্রেও আমেরিকা ম্যাচ ৭'-এর আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ আমেরিকা এখন শব্দের গতির চেয়ে সাতগুণ অধিক গতিতে উড়তে পারে। 'ম্যাচ ৭' কারিগরী দলের নির্দেশক ছিলেন ভারতের মীরাট শহরে বসবাসকারী বৈজ্ঞানিক অজয় কুমার। এখন তিনি 'ম্যাচ ১০' বৈজ্ঞানিক দলের নির্দেশক হয়েছেন। তিনি এখন এরকম একটি রকেট নির্মাণ করছেন যার গতি প্রতি ঘণ্টায় ১২০০০ কিলোমিটার হবে। আর ডঃ শিব সুব্রহ্মণ্যম্‌কে কে না জানে! তিনি গত ২০ বছর যাবৎ আমেরিকার মহাকাশ পরিযোজনার সহায়ক সংযোজক ছিলেন এবং তাঁর সাথে হোয়াইট হাউসের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জন্য এটা আরও আনন্দের বিষয় যে, ডঃ সুব্রহ্মণ্যম তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক এবং ত্রিশ বছর যাবৎ আমেরিকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি আছেন।

তথ্য-প্রযুক্তির (আই টি) উন্নয়ন আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে শুরু হয়েছে, যার ৩৫ শতাংশ কোম্পানী ভারতীয়দের। আমেরিকায় ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে বহুজাতিক কোম্পানীতে কার্যরত ভারতীয়দের দ্বারা করানো পেটেন্টস্‌-এর তালিকা দেখুন, আপনারও গৌরব অনুভব হবে। বিশ্বব্যাপী ভারতীয় যুবসমাজের প্রতিভার ব্যাপক বিস্তারের জন্য— টেক্সাস ইনষ্ট্রুমেন্টে ২২৫, ইন্টেলে ১২৫, সিস্কো সিস্টেমে ১২০, আই বি এমে-১২০, ফিলিপ্‌সে ১০২ এবং জি ই-তে '৯৫ টি পেটেন্ট হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এরকমই ভারতীয় প্রতিভাগুলির এক সার্বিক চিত্র প্রস্তুত করেছেন শ্রীরবিকুমার তাঁর পুস্তক 'হিন্দু প্রতিভার দর্শন'-এ। (প্রকাশক-সুরুচি প্রকাশন, কেশব কুঞ্জ, ঝাণ্ডেলওয়াল, নয়াদিল্লী-১১০০৫৫, মূল্য-২৫০)

হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক যুগ্ম সংযোজক শ্রী রবিকুমার গত ২০ বছরে ৩০ এরও অধিক দেশে ভ্রমণ করে সেখানকার পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার সুবাস কাছ থেকে অনুভব করেছেন।

বর্তমানে আমেরিকা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সবচেয়ে আগে রাখার জন্য ভারতীয়দের উপরই নির্ভর করছে। তাদের প্রতি বছর প্রায় ৮০,০০০ কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের প্রয়োজন পড়ে। এজন্য আমেরিকার ছাত্র-ভিসা-প্রাপকদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ ছাত্র ভারতীয়; সেখানে চীন, ইংল্যাণ্ড সহ যে কোনও দেশের ছাত্র ৫—৭ শতাংশের বেশি নয়। এর মধ্যে আমেরিকার সি এন বি সি টিভি চ্যানেল তাদের '৬০ মিনিটস্‌' কার্যক্রমের নির্মাতা লেস্‌লী স্টলের বক্তব্যে পুরো পরিস্থিতি উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, আমেরিকা নিজের জন্য তেল আমদানি করে আরব থেকে, মোটর গাড়ীর আমদানি কোরিয়া থেকে এবং হুইস্কির আমদানি স্কটল্যাণ্ড থেকে আর আমরা ভারত থেকে আমদানি করি বাস্তবিক কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা লোক, যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের উন্নয়নের ভাগীদার।... বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের আই আই টি-র স্নাতক আমেরিকার স্নাতকদের লজ্জায় ফেলে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনায় শ্রীরাম

(৮ পাতার পর)

দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-জ্ঞান দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়া বোধহয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখ ভোগ করেতেছি।....''ওই সময়ে আহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত। ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা -আপনি হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মতো করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না তাহা ও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না। বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর রঘুবীর রঘুবীর বলিয়া গম্ভীর স্বরে চিৎকার করতাম, চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ওই সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল (Enlargement of the coccyx)। শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ''মহাশয় আপনার শরীরে ওই অংশ কি এখনও ওইরকম আছে? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, না। মনের উপর হইতে ওই ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।''

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া শ্রীশ্রী সারদা মায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একটি ঘটনা নিম্নরূপ ঃ—

শ্রীমায়ের তীর্থযাত্রার সঙ্গী ও সেবক স্বামী ধারানন্দজী একদিন সরলাদেবীকে বলিয়াছিলেন যে, ''অনাচ্ছাদিত রামেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিয়া শ্রীমা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে''। কাছে যে ভক্তেরা ছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মা, ও কি বললে?'' মা তখন আত্মসংবরণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রামেশ্বরাদি দর্শনান্তে তিনি কলকাতায় ফিরিলে কোটালপাড়ার কেদারবাবু প্রশ্ন করিলেন ''রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?'' মা উত্তর দিলেন ''বাবা যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন''। সদা উৎকর্ণা গোলাপ মা পাশের বারন্দা দিয়া যাইতেছিলেন। কথাটা কানে উঠিবামাত্র তিনি সোৎসাহে চাপিয়া ধরিলেন ''কি বললে মা?'' মা একটু চমকিত হইয়া উত্তর দিলেন ''কই কি বলব?'' বলছি এই তোমাদের কাছে যেমন শুনেছিলুম, ঠিক তেমনটি দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। গোলাপ মাও নাছোড়বান্দা হইয়া বলিলেন, ''না, না, আমি সব শুনেছি এখন আর কথা ফেরালে কি হবে? কেমন গো কেদার''? বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন এবং সকলকে উহা জানাইয়া দিলেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, যিনি ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রেয়সী জন্মদুঃখিনী সীতাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া সমুদ্রতীরে বালুকানির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। তিনিই পুনঃ কলিতে সর্বংসহা, অশেষ কল্যাণময়ী ভক্তজননীরূপে অবতীর্ণা। স্বপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গকে এত দীর্ঘকাল পরে একইরূপে থাকতে দেখিয়া সহসা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া গিয়া ত্রেতা- যুগে উপনীত হইয়াছিলেন।

ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ ‘পুনরুত্থান’

বিকাশ ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশী বাংলা ছবি করেন না। বছরে একটাও নয় বোধহয়। তিনিই একমাত্র অভিনেতা যিনি একই সঙ্গে হলিউড, মুম্বাই এবং কলকাতায় তিন ভাষায় ছবি করেন।

সম্প্রতি পৈলান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ- এর প্রযোজনায় ‘পুনরুত্থান’ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্র মল্লিকের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন। এমন একটা সময় ছিল যখন বাঙালী অন্যসবের মতো শিল্প-বাণিজ্যেও এগিয়ে ছিল। অভিজাত এইরকম এক শিল্পপতি যিনি আজ বৃদ্ধ বয়সে ছেলেদের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অবসর জীবন-যাপন করছেন কিন্তু অপদার্থ ছেলেদের অবিমিশ্রকারিতায় তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পটেটো ফ্লেক্সের ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় মরমে মরে আছেন। পাওনাদার-অর্থলগ্নীকারীদের কোর্ট-কেসে তিনি তাঁর নিজে হাতে গড়া শিল্পতালুক— এমনকি অভিজাত পল্লীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাও হারাতে বসেছেন। আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন অথচ পরিস্থিতির শিকার এক প্রখর দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সম্পন্ন পরিবার কর্তার অসহায়তা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মরমী অভিনয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। একদিকে অসাধু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে নিজের ছেলেদের যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতার চাপ সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ মহেন্দ্র মল্লিকের একমাত্র অবলম্বন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু তিনি যেন মেনে নিতে পারেন না। তবু এতো বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে আর একবার ঘুরে দাঁড়াতে চান। পাশে পান তাঁর কন্যাসমা আশ্রিতা ডোনাকে। অসাধু ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেখিয়ে দিতে চান বাঙালিও ব্যবসা বোঝে। তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। ‘পুনরুত্থান’ হবেই। কিন্তু বাধ সাধে তাঁর দুই ছেলে এবং আশ্রিত বিক্রম। তারা অর্থ, নিরাপত্তা ও চাকচিক্যময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এমনই এক সময়ে দেবদূতের মতো হাজির হয় এন আর আই এক ধনাঢ্য শিল্পপতি সিদ্ধার্থ মল্লিক। পাশে দাঁড়ায় মহেন্দ্র মল্লিকের। নীলাম থেকে বাঁচায় মল্লিকবাড়ির সবকিছু। কে এই সিদ্ধার্থ? মল্লিকবাড়ির জন্য তাঁর কেন এতো দরদ? সে প্রকৃতই মহেন্দ্র মল্লিকের হিতাকাঙ্ক্ষী না তাঁর আশ্রিতা ডোনার প্রতি অনুরক্ত হয়ে অন্য এক কৌশলের খেলায় মেতেছে সে? কাহিনীর চমক এইখানেই। যা পর্দায় দেখাই ভালো। কাহিনীর একটা টান ছিল এই ছবিতে। যার কৃতিত্ব পৈলান গ্রুপের চেয়ারম্যান অপূর্ব সাহার। কারণ তিনিই এ ছবির কাহিনীকার। ছিল একটা কর্পোরেট জগতের টানাপোড়েন— যা সাধারণত অন্যান্য বাণিজ্যিক ছবিতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রধান পরিচালক ঋষি মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় মুন্সীয়ানার অভাব ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে পারেনি। নামীদামী তারকা নিয়েও তিনি চূড়ান্ত অসফল। রাজা মুরাদ, রিমা লাগু এবং নায়ক প্রিয়াংশু এসেছেন মুম্বাই থেকে, কলকাতার সব্যসাচী চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সোমা দে, রাজেশ শর্মা এবং নায়িকা ঋতুপর্ণাও শেষরক্ষা করতে পারলেন না।

যদিও এদের মধ্যে ঋতুপর্ণা ও সব্যসাচীর অভিনয় মন কাড়ে। কিন্তু চিত্রনাট্যের বাঁধন আলগা হলে ছবির যা হাল হয় এখানেও তাই হয়েছে।

পৈলান গ্রুপ অনেকবার ট্যালেন্ট হান্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া তাদের অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউটের অনেক নতুন ছেলেমেয়েরা এই ছবিতে তাদের মুখ দেখানোর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু কেউই নজর কাড়তে পারেননি। রবীন্দ্র জৈনকে এই বৃদ্ধ বয়সে কেন টানা হলো, বোঝা গেল না। তিনি তো একরকম অবসর জীবনই যাপন করছিলেন। প্রায় ডজনখানেক মুম্বাই- কলকাতার নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীদের গাওয়া সত্ত্বেও একটা গানও হল থেকে বের হওয়ার পর মনে থাকে না।

তবু ভালো থিম নিয়ে একটা ভালো ছবি করার চেষ্টা ছিল। পরিচালক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি একটা ভালো বক্তব্যসম্পন্ন ছবি করবেন, নাকি ডজন খানেক গান, আইটেম নাচ, খলনায়কদের চাতুরী, মায়ের চোখের জলের ককটেল দিয়ে বাজার ধরবেন! তাই সমস্ত সম্ভাবনার গঙ্গাপ্রাপ্তি! ব্যতিক্রমী ছবি হতে গিয়েও হলো না, বাজারও পেল না।

বর্ষপ্রতিপদের পূর্ব-সন্ধ্যায় বর্ষবরণ

বাসুদেব পাল॥ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘ভারতবর্ষের প্রাণভোমরাই ধর্ম’। এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই এদেশে আধ্যাত্ম অনুসারী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। সারা বিশ্ব সেই আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করেছে। এর দ্বারাই বিশ্বমঙ্গল বিশ্বশান্তি সম্ভব। পুরুষার্থের মাধ্যমে বর্তমান অনুকূল অবস্থার সুযোগে এগিয়ে যেতে হবে। সাধুর বেশে যে ‘রাবণ’ আসছে তাকে চিনতে হবে। হিন্দু সমাজ থেকে একজনও যেন পশ্চিমী চক্রান্তের শিকার না হন। আর যারা জেনে অথবা অজান্তে তাদের সাহায্য করছেন তাদেরকেও সাবধান করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।’ উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক বালকৃষ্ণ নায়েক-এর। তিনি গত ৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কলকাতার বিনানী ধর্মশালার সভাগৃহে ভারতীয় নববর্ষ উৎসব সমিতি কর্তৃক নববর্ষ বরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশাল সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন।

বস্তুত পক্ষে বিক্রম সংবৎ ২০৬৮, পৃথিবীর প্রাচীনতম কালগণনা চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। ১লা জানুয়ারী নয়, এই দিনটিই নববর্ষ হিসেবে সকল ভারতীয়ের পালন করা ও গ্রহণ করা উচিৎ বলে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্যে জোর দেন।

সভায় স্বাগত ভাষণ দেন মারওয়াড়ি সম্মেলনের রাজ্য সভাপতি বিজয় কুমার গুজরবাসিয়া। এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রকাশ চান্দোলিয়া, রাজস্থান পত্রিকার স্থানীয় সম্পাদক রাজীব হর্ষ, পূর্ণিমা কোঠারী এবং সভার সভাপতি তথা আর্যসমাজের সাধারণ সম্পাদক দীনদয়ালজী গুপ্তা।

ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রসিদ্ধ সমাজসেবী পুষ্করলাল কেডিয়া। সুনিপুণভাবে সভা পরিচালনা করেন স্নেহলতা বৈদ। মধ্য কলকাতার পঁচিশটি সমাজসেবী সংস্থা এবং ২৫/২৬ জন স্বনামধন্য সমাজসেবী মিলে ‘ভারতীয় নববর্ষ উৎসব সমিতি’ গঠন করে বর্ষপ্রতিপদের পূর্ব সন্ধ্যায় বর্ষবরণের সুন্দর ও সার্থক আয়োজন করেন। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী রাজকুমার জৈন ও সহশিল্পীবৃন্দের নৃত্যগীতি আলেখ্য এবং ভজন উপস্থিত সকলের মন কেড়ে নেয়। শেষে ধন্যবাদ জানান অন্যতম সংযোজক মনমোহন গারোদিয়া। অন্য চারজন সংযোজক— বিনয় দুবে, রাজেশ কুমার আগরওয়াল, পূর্ণিমা কোঠারী এবং শৈলেশ বাগড়ী।

একান্ত সাক্ষাৎকার : রাহুল সিন্‌হা

শান্তি, উন্নয়ন ও সুশাসনের অঙ্গীকার রাজ্য বিজেপি'র

বিজেপি'র রাজ্যসভাপতি রাহুল সিন্‌হার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

❑ বিজেপি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। সুতরাং রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনেই তাদের প্রার্থী দেওয়া উচিৎ। এই যুক্তিটা বহুশ্রুত। কিন্তু মাত্র ৫টা আসন জোটসঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে বাকি ২৮৯ টি আসনে এককভাবে প্রার্থী দেওয়ার পেছনে অন্য কোনও ব্যতিক্রমী ভাবনা কি কাজ করছে?

● একথা ঠিক যে বাংলার একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ সিপিএমকে আর কোনওভাবেই চাইছেন না। প্রথম প্রথম তাঁরা ভেবেছিলেন ওই জায়গায় তৃণমূলকে বিকল্প হিসেবে দেখা যায় কিনা। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে মানুষ বুঝতে পারছে যে সিপিএম আর তৃণমূলের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। দু'দলই খুনোখুনির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মানুষ শান্তি চান। একসময় এই সিপিএম-ই মাওবাদীদের পক্ষে ছিল। তখন তৃণমূল 'সিপিএম-মাও যোগাযোগ' নিয়ে চিৎকার করতো। আজ তৃণমূল-মাওবাদী যোগাযোগ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা এককথায় বলতে চাই, সিপিএমের ঘরে মাওবাদীদের জন্ম হয়েছে আর তার লালন-পালন করছে তৃণমূল। ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, অথচ দু'দলেরই এনিয়ে কোনও হেলদোল নেই। যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চরমে তখন সিপিএম পেছনের দরজা দিয়ে বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়ে দিল অস্বাভাবিক হারে, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও পেট্রোল- ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিল কয়েক দফায়; সরকারের জোটসঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস তাই নিয়ে টুঁ-শব্দটিও করলো না। সিপিএমের জমানায় একের পর এক কেলেঙ্কারী—জমি কেলেঙ্কারী, বেঙ্গল-ল্যাম্প কেলেঙ্কারী, ট্রেজারি কেলেঙ্কারী, রাজারহাটে জমি কেলেঙ্কারী, বিপিএল তালিকা, মিড-ডে মিল সবেতেই মারাত্মক আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের অধীনস্থ দু'টো জেলা পরিষদ— পূর্ব-মেদিনীপুর ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা; ক্যাগ রিপোর্ট বলছে যে একশো দিনের কাজ চুরিতে রাজ্যের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর প্রথম, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা দ্বিতীয়। এথেকে বোঝাই যায়, যে জিনিস সিপিএম করেছে, আজ তৃণমূল কংগ্রেসও সেই জিনিসই করছে। কেন্দ্রের ১ কোটি ৭৬ লক্ষ কোটি টাকার স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী, কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারী, সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখা নিয়ে কেলেঙ্কারী— তৃণমূল কিন্তু এসব ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না। ২০০১ সালে একটা কাল্পনিক কেলেঙ্কারীর জন্য তৃণমূল নেত্রী এন ডি এ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কেন্দ্রের এত দুর্নীতি-র পরেও তিনি বলছেন, আমি মনমোহন সিং সরকারের পাশে আছি। মনমোহন সিং-এর ভাবমূর্তি নিয়েই আজ প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। টেলিকম দুর্নীতি মনমোহন সিংয়ের দপ্তর অবধি পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং তিনি আদৌ কতটা সৎ, সে প্রশ্নও আজ সঙ্গতভাবে উঠছে। এরপর শিল্পের কথাই ধরুন। টাটাকে চলে যেতে হলো কেন? আমরাও স্বীকার করি যে তিনফসলী বা চারফসলী জমিতে শিল্প গড়ে তোলা উচিৎ নয়। কিন্তু সিঙ্গুরে যখন টাটাকে জমি দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তাদের নির্মাণের কাজও শেষলগ্নে, কারখানা উদ্বোধন হবো হবো করছে; ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের ফিরে যেতে হলো স্রেফ সিপিএম- তৃণমূলের ইগোর লড়াইয়ের জন্য। এর ফল হলো যে টাটা চলে যাবার পর আর অন্য কোনও শিল্পপতি এখন পশ্চিমবঙ্গে আসতে ভয় পাচ্ছেন। এরপর দেখা গেল রাজ্য সরকার কোথাও শিল্প গড়তে চাইলে তৃণমূলের লোকেরা ঝান্ডা নিয়ে গিয়ে সেখানে বাধা দিচ্ছে, আবার রেলমন্ত্রী যেখানে শিল্পের ঘোষণা করছেন সেখানে সিপিএমের লোকেরা নামে-বেনামে পৌঁছে যাচ্ছেন দিদির শিল্প হতে দেব না বলে! ফলে দাদা-দিদির লড়াইয়ে বাংলার শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। বেকার সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। তারপর দেখুন, কোনও মুসলমান কিন্তু সংরক্ষণ চায়নি। হঠাৎ তৃণমূল নেত্রী মুসলমান ভোট পাওয়ার স্বার্থে একদিন ঘোষণা করলেন, 'আমার দল সরকারে এলে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ চালু করবো'। তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে পাল্লা দিতে গিয়ে রাজ্য-সরকারের পক্ষে বুদ্ধবাবু ঘোষণা করে দিলেন যে তাঁরা মুসলিমদের জন্য সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণ চালু করছেন। আমরা এখানে স্পষ্ট বলতে চাই, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা উচিত নয়। আর্থিক অনগ্রসরতার বিচারে সংরক্ষণ হোক। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, তৃণমূল আর সিপিএমে কোনও তফাৎ নেই। আর কংগ্রেস তো বহু আগেই সিপিএমের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। সেই দৃষ্টিতে মানুষ এখন একটা তৃতীয় বিকল্পের সন্ধান করছেন।

বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ সভাপতি রাহুল সিন্‌হার।

সেইজন্য ২৯৪ টি আসনে অধিকাংশেতেই আমাদের, বাকি কয়েকটিতে আমাদের সমর্থিত প্রার্থী দেওয়া হয়েছে; যাতে মানুষ যদি মনে করেন আমাদের ভোট দেবেন তবে তাঁরা যেন প্রার্থীর অভাবে আমাদের ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত না হন। আমরা মানুষকে এটাই বলছি, যদি এরাজ্যে শান্তি কেউ স্থাপন করতে পারে তবে সেটা বিজেপি-ই পারবে। যদি সুশাসন কেউ দিতে পারে, তবে সেটা বিজেপি-ই পারবে, বাজপেয়ীজী'র নেতৃত্বে ছ' বছরের সরকারই তার প্রমাণ। আজ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন— গুজরাট, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়; ক্রমান্বয়ে এরা উঠছে, আর পশ্চিমবঙ্গ খালি পিছিয়েই যাচ্ছে।

❑ আপনার এই যুক্তিটা মেনে নিয়েও অনেকে বলছেন বিজেপি-র কি সাংগঠনিক শক্তি এতটাই রয়েছে যে আপনারা একাই পরিবর্তন আনতে পারবেন? মাঝখান থেকে এর ফলে তো সিপিএম প্রকারান্তরে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা।

● দেখুন; প্রথমত, বিজেপি রাজ্যের প্রতিটি আসনে যাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে তাঁরা কিন্তু বাইরে থেকে ভাড়া করা নন। তাঁরা প্রত্যেকেই বিজেপি'র দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা। ফলে বিজেপি'র যে রাজ্যের সর্বত্র অন্তত ব্যাপ্তিটুকু আছে এটাই তার বড় প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, কার ভোট কে কাটবে, না কাটবে তা ভাবার দায়িত্ব আমাদের নয়। আসল কথা হচ্ছে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। সিপিএম- তৃণমূল দুই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। তবে আমি মনে করি যেহেতু সিপিএমকে মানুষ তো একপ্রকার পরিত্যাগ করেই দিয়েছে, তাই লড়াইটা হবে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি-র। এই দুই দলের মধ্যে মানুষ কাকে বাছবেন সেটা তাঁদের বিচার্য বিষয়। তবে সিপিএমের পক্ষে আসা আর সম্ভব নয়। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। মানুষকে শুধু একটা কথাই বলছি, কে জিতবে, কে জিতবে না এসব অঙ্কের হিসেব বন্ধ করুন। আপনি যদি ভোট দেন তবে বিজেপি-র জয় কেউ আটকাতে পারবে না।

❑ ৩০ নভেম্বর, ২০০৯— বিজেপি-র ডাকে রাজ্যজুড়ে সংঘটিত বাংলা বনধ ও গত ৩০ নভেম্বর, বিজেপি'র মহাকরণ অভিযান, বিজেপি'র রাজ্য নেতৃত্বকে এই সফল কার্যক্রম কতটা উৎসাহিত করেছে?

● একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ২০০৯-এর ৩০ নভেম্বর আমাদের একক শক্তিতে করা বনধটাই আসল টার্নিং পয়েন্ট। ওটাই মানুষকে প্রথম জানান দিয়েছিল যে বিজেপি-ও পশ্চিমবঙ্গে আছে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর আমরা যে মহাকরণ অবরোধের ডাক দিয়েছিলাম; সেখানে চারদিক দিয়ে মহাকরণকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। জেনে রাখুন, ১৩ সালে মমতা ব্যানার্জী'র মহাকরণ অবরোধের পর আর কোনও রাজনৈতিক দল এভাবে চারদিক দিয়ে মহাকরণকে ঘিরে ফেলার হিম্মত হয়নি। ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এসপ্ল্যানেড ইস্টে একটা সভা ছিল। আমাদের জনসভার চারদিকের একদিকে যা লোক ছিল, ওনার জনসভায় তার চাইতেও কম লোক ছিল। ৩০ নভেম্বর, ২০০৯ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০১০ বিগত এক বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বহু বিষয়ে আমরা পথে নেমেছি। প্রত্যেকটি কার্যক্রমই দারুণ আশাব্যঞ্জক। তারপর নব-জাগরণ রথযাত্রা নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তার একটা ছোট্ট ঝলকও আমরা শহীদ মিনারে দেখেছি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের সমর্থন ক্রমশ বিজেপি-র দিকে আসছে।

❑ আপনি এবার ভোটে দাঁড়ালেন না কেন?

● পুরো নির্বাচন-ব্যবস্থাটা সামনে থেকে পরিচালনা করতে চাই তাই দাঁড়াইনি। যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যেমন আদবানীজী, গড়করিজী'র প্রবল চাপ আমার ওপর ছিল, ভোটে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু এবার স্থির করেছি আমি তো দাঁড়াবই না, বিজেপি-র কোনও জেলা- সভাপতিকেও এবার ভোটে দাঁড়াতে দেব না। পরিবারের মুখ্য ব্যক্তি যিনি তারই তো নির্বাচন পরিচালনা করা উচিৎ, তিনিই রণনীতি স্থির করবেন। সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাশা করে থাকে। আজকে আমি যদি কোথাও দাঁড়াই তো নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাব। আমি মনে করি এই মুহূর্তে এরকম স্বার্থপরতার কোনও যৌক্তিকতা নেই। সামনে থেকে সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করার স্বার্থে এবার রাজ্য-সভাপতি বা জেলা- সভাপতিরা তাই কেউ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না।

❑ কোন অ্যাজেন্ডাগুলোকে পশ্চিমবঙ্গের এই বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সামনে আনছেন?

● শান্তি আর উন্নয়ন; যাতে কোনও ছেলে কলেজে পড়তে গিয়ে চোখ না হারায়, কোনও মেয়ে টিউশন পড়তে গিয়ে ধর্ষিতা যাতে না হতে হয়। মানুষ প্রথম শান্তি চায়। তার পরে এরপর চাইবে তাঁরা উন্নয়ন। সিপিএমের উন্নয়ন যে কি জিনিস মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আর তৃণমূলের না আছে কোনও অ্যাজেন্ডা, না আছে কোনও কিছু। তাদের একটাই লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ মুখ্যমন্ত্রীর গদি দখল করা। মানুষ দেখেছেন সারাদেশে কতো রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার চালাচ্ছে, বিজেপি দেখিয়ে দিয়েছে উন্নয়ন কাকে বলে। শান্তি আর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বেকার সমস্যার সমাধান, শিল্প গড়ে তোলা হবে, কৃষকদের ফসল বা শস্য উৎপাদনের জন্য ন্যায্য মূল্য প্রদান— এগুলোর কার্যকরী করাই হবে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এর সঙ্গে, মুসলিম তোষণের রাজনীতির জন্য যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে... আমরা চাই হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই নতুন বাংলা গড়ে উঠুক। বাংলাদেশ থেকে নিজেদের জীবন বাঁচাতে, ধর্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, খৃস্টানরা এদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। এঁরা শরণার্থী, এঁদের আশ্রয় দিতে ভারত সরকার তাই বাধ্য। আমরা সেই দাবী-ই জানাচ্ছি। অপরদিকে মুসলমানদের দেখুন, সম্পূর্ণ আর্থিক লাভের কারণে এবং ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গকে ধর্মীয় সংখ্যার নিরিখে পুনরায় ভাগ করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার সার্থক রূপায়ণ করতেই তারা বাংলাদেশ থেকে এখানে চলে আসছে। এদের আমরা অনুপ্রবেশকারী বলছি এবং ভারত থেকে বিতাড়নেরও দাবী জানাচ্ছি।

❑ আপনাদের জোটসঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রায় গোটা ১২ আসনে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটকে নিঃশর্ত সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। কিভাবে দেখছেন বিষয়টিকে?

● দেখুন ওদের সাথে আমাদের যা কথা হয়েছিল তাতে করে আমরা পাহাড়ের তিনটি আসন (দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং) এবং সমতলের কালচিনি আসনে ওদের সমর্থন করবো। তার পরিবর্তে ওরা সমতলের যে আরও পাঁচটি আসনে ওদের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলিতে আমাদের সমর্থন করবে। হঠাৎ করে তাদের এই সিদ্ধান্তে— যে কেবলমাত্র মাদারীহাট ছাড়া বাকিগুলোতে তৃণমূল- কংগ্রেসকে সমর্থনের কথায় আমরা কিছুটা বিস্মিত; কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পুরো বিষয়টাই জানিয়েছি। তবে এর ফলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে কংগ্রেস-তৃণমূলের একটা সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। এ থেকে স্পষ্ট— যারা এনিয়ে এতদিন বিজেপি-কে দোষারোপ করতো, তাদের সঙ্গেও তলে তলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সম্পর্ক রয়েছে।

❑ এবার আপনারা যেটুকু জানিয়েছেন যে এরাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে ২৭০টি বড় জনসভায় যোগদান করবেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং সেইসঙ্গে বিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও কোনও না কোনও জনসভায় উপস্থিত থাকবেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এনে এরাজ্যের মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছে রাজ্য বিজেপি?

● মুখ্যমন্ত্রীরা এরাজ্যের মানুষকে এই প্রতিশ্রুতিই দিতে আসছেন যে আপনারা বিজেপি-কে এখানে সরকার গড়ার সুযোগ দিন। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যেভাবে আমাদের রাজ্যকে আমরা উন্নতির শিখরে নিয়ে গিয়েছি তেমনি পশ্চিমবঙ্গকেও উন্নতি'র শিখরে নিয়ে যাব। রাজ্যের মানুষকে এই নিশ্চয়তাটুকু দিতেই তাঁরা আসছেন।

❑ এটা মনে করা হচ্ছে যে ২০১১-র নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে এরাজ্যে রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘর্ষ আরও খানিকটা বাড়বে। সেই পর্যায়ে কতটা দায়িত্বশীল ভূমিকায় আমরা রাজ্য- বিজেপি-কে দেখতে পাব?

● রাজ্যে হানাহানি, খুন-দাঙ্গা তো তৃণমূল- সিপিএম শুরু করেই দিয়েছে। সংগঠন আমাদের রয়েছে, আমরা সবাই এক পরিবারভুক্ত হয়ে কাজ করছি, আইন-আদালত রয়েছে; সবমিলিয়ে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলা আমরা এইসব-কে নিয়েই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান
১৪ এপ্রিল, ২০১১, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬টায়
স্থান : রামমোহন হল
প্রধান বক্তা : মাননীয় সুরেশ সোনী
সহ-সরকার্যবাহ, আর এস এস
সবারে করি আহ্বান

প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১
নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৮
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার পূর্বে 'পরমহংসমশাই', উপহাসবাদীরা বলতো 'প্রেতগুরু'। আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার পর তিনি হলেন 'ঠাকুর'। স্বামীজীর কথায় 'অবতারবরিষ্ঠ'। ঠাকুরের লীলায় বেদান্তদর্শন উপস্থাপিত হলো অন্য ব্যাখ্যায়। গৃহী আর ত্যাগী — এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত হলো এক অনন্য দর্শন। এই মহামানবের ১৭৫তম জন্মজয়ন্তীর অবসরে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।
লিখেছেন ঃ— স্বামী আত্মবোধানন্দ, হরিপদ ভৌমিক, সঞ্জয় ভুঁইয়া, বিনায়ক সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুহঠাকুরতা প্রমুখ।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।

Swastika
11 April - 2011, Rs. 4.00 only

RNI No.5257/57

Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ভাবুন!
গভীর ভাবে ভেবে দেখুন!

- কোটি কোটি সংখ্যায় যারা, স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক দেশভাগের পরেও, হিন্দুস্থান তথা পশ্চিমবঙ্গে সমান অধিকারের থেকেও বিশেষ অধিকার ভোগ করছে, তারা কি আজও 'সংখ্যালঘু'?
- অনেক রাজনৈতিক দল এদেরকে সংখ্যালঘু বলে ভোটের রাজনীতি করছে, এককাট্টা ভোট পাওয়ার জন্য। Common Civil Code বা অভিন্ন দেওয়ানী বিধি'র কথা তারা একবারও মুখ খুলে বলেন না।
- দেশ বিভাজনের ৬৪ বছর পরেও কি 'সংখ্যালঘু' রক্ষাকবচ মেনে নেওয়া যায়? ভাবুন! গভীরভাবে ভাবুন!
- এমনকি Nationalist Muslim ভাইয়েরাও ভেবে দেখুন।

আপনার ভোট দিন রাষ্ট্রের স্বার্থে।

-: Courtsey :-

Issued in Public Interest by

Forum of Nationalist Thinkers'

12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069

Mob. : 9433047202 / 9051498919

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স - ২২৪১৫৯১৫
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com